জাপানের ট্যাক্সি ড্রাইভার

- স্বামী মেধসানন্দ

প্রায় দু দশক আগে যখন জাপানে প্রথম আসি তখন এখানকার অনেক কিছুই আমাকে চমক লাগিয়েছিল, বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে তুলনা করে, যেমন এখানকার ট্যাক্সি ও তার ড্রাইভার । ট্যাক্সিগুলি যেমন বড় তেমনি ঝক্‌ঝকে – তাদের চালকও ফিট্‌ফাট বাবু । কেতাদুরস্ত তাদের পোষাক । মাথায় ক্যাপ, গলায় নেকটাই, গায়ে দামী শার্ট, আর হাতে গ্লাভ্‌স্ । ধীরে ধীরে তাদের সে পোষাকে অবশ্য বিবর্তন এসেছে । এখন তাদের পোষাক-আষাক অনেকটাই সাধারণ, মাথায় ক্যাপও নেই, হাতে গ্লাভ্‌স্‌ও নেই । কিন্তু তাদের আচরণ, আদব-কায়দা একইরকম যা জাপানের বৈশিষ্ট্য । সেখানে কোন পরিবর্তন নেই ।

প্রধানত দূরে কোথাও যাওয়ার সময় যখন সঙ্গে সুটকেস থাকে তখন আশ্রম থেকে স্থানীয় জুসি স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া ও আসার সময় আমি ট্যাক্সি চড়ে থাকি । একসময় অবশ্য আশ্রমের গাড়িও ছিল না । বার বার ট্যাক্সি চাপার এবং আমার গেরুয়া পোষাকের সুবাদ – যা এখানে একেবারেই বিরল, অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভারই আমাকে তথা বেদান্ত কিয়োকাইকে চেনেন । জুসি স্টেশন থেকে ফেরার সময় ট্যাক্সিতে চাপলে অনেক ড্রাইভার আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই সোজা আশ্রমে নিয়ে আসেন । কেউ কেউ জানলেও একটু যাচাই করে নেন, 'বেদান্ত তো''! 'নিপ্পন বেদান্ত কিয়োকাই' তাদের কাছে শুধুই 'বেদান্ত' । আমি তাই মজা করে বলি আমাদের ভক্তরা কতখানি বেদান্ত জানেন জানি না, কিন্তু এখানকার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা অনেকেই 'বেদান্ত' জানেন ।

এখানকার ট্যাক্সিতে চড়া ছাড়াও 'তোকিয়ো' বা জাপানের দূর অঞ্চলে ট্যাক্সিতে চাপার অভিজ্ঞতা আমার বেশ ভালমতই আছে । সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই লেখা ।

যখন প্রথমে এ দেশে এসে জাপানী প্রায় কিছুই জানতাম না, অথচ সঙ্গে কোন জাপানী ভক্তও থাকতেন না তখন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল বোঝাতে হিমসিম খেতে হত । কারণ ড্রাইভাররা প্রায় কেউই ইংরাজী বলতে পারেন না । সে সমস্যার সমাধান করা গিয়েছিল ঠিকানা জাপানী ভাষায় লিখিয়ে যা দেখানো হত ড্রাইভারকে । স্বভাবতঃই আমার তখনকার ট্যাক্সি ভ্রমণ ছিল নির্বাক ।

তারপর যখন একটু একটু জাপানী বলতে শিখলাম তখন তা চর্চা করার জন্যও বটে এবং তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল মেটানোর জন্যও বটে তাদের সঙ্গে নিজেই আলাপ করতাম । বলা বাহুল্য আমার সেই জাপানী সংলাপের মধ্যে ভুল শব্দ, ভুল উচ্চারণ থাকলেও তারা তো দোষ ধরতোই না, বরং জাপানী বলার চেষ্টাটাকেই প্রশংসা করতো । ধীরে ধীরে জাপানী বলাটা যখন আরও একটু সড়গড় হলো তখন তাদের তথা জাপানীদের সম্বন্ধে আমার ধারণারও পরিবর্তন হতে থাকলো । একসময় আমারও মনে হতো – যেমন স্বল্পকালের জন্য বেড়াতে এসে বিদেশীরা ভেবে থাকেন – যে জাপানীরা কথা বলে কম, হাসেও কম । এখন আমার ধারণা জাপানীরা, ও তাদের ট্যাক্সি ড্রাইভাররাও কথাবার্ত্তা, আলাপ করতে যথেষ্টই ভালোবাসে ।

আর তাদের সততা তো প্রশ্নাতীত – বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া । আমার মনে পড়ে না এদেশে কোন দোকানদার আমাকে ঠকিয়ে বেশি দাম নিয়েছে, বা ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে বেশি ভাড়া আদায় করেছে । বরং বিপরীতটাই দেখেছি । একটা উদাহরণ দিই । একবার রাতে ট্যাক্সি করে আশ্রমে ফিরছি । ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে এমন একটি রাস্তায় হাজির হলেন যেটা আমার অপরিচিত । আমি তখন আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই রাস্তাটা কি আমাদের ঠিকানায় যাওয়ার রাস্তা' ? তখন ড্রাইভার ঠাহর করে দেখে বুঝতে পারলেন 'সেটা ভুল রাস্তা' । প্রথমেই তিনি যা করলেন তা হোল ট্যাক্সির মিটারটাকে বন্ধ করা এবং ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়ার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করা । তারপর ঠিক রাস্তা ধরে আশ্রমে নিয়ে এলেন । মিটার বন্ধ করার সময় যে ভাড়া উঠেছিল তার থেকে যখন বেশি ভাড়া দিতে গেলাম, যেহেতু তাকে আরও অনেক রাস্তা আসতে হয়েছে তিনি কিছুতেই তা নিলেন না, বরং বলতে লাগলেন, 'না, এটা তো আমারই ভুল আর সেজন্য আমি খুব দুঃখিত' ।

আমার পকেটে সাধারণত প্রসাদী চকোলেট থাকে । ক্ষেত্র বিশেষে একে ওকে, বিশেষতঃ বাচ্চাদের দিয়ে থাকি । ট্যাক্সি ড্রাইভারদেরও প্রায় দিয়ে থাকি, আর তারা তাতে এত খুশী হয় ! একবার হল কি আমি যখন আশ্রমের নিচের নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে আশ্রমে ফিরছি হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আমার ঠিক সামনে এসে থেমে গেল । তাতে অবশ্য তখন কোন আরোহীও ছিল না । ট্যাক্সির ড্রাইভার পাশের কাঁচের জানালা নামিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে ডাকলেন । আমি একটু অবাক হয়ে কাছে যেতেই আমাকে একমুঠো চকোলেট দিয়ে বললেন, 'এই চকোলেটগুলো ওকিনাওয়ার । আপনি খাবেন' । তারপর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি চালিয়ে দিলেন । আমি অবাক হয়ে ভাবছি, 'ব্যাপার কি' ! হঠাৎ মনে পড়লো, 'ঐ ড্রাইভারকে কিছুদিন আগে আমি চকোলেট দিয়েছিলাম । এটা তার প্রতিদান'।

আর একবার ট্যাক্সি করে তোকিয়োতে কোথায় একটা যাচ্ছিলাম । সময়টা গরমকাল । সে বছর ঐ সময় বেশ কয়েকবার বৃষ্টি হওয়াতে গরম তেমন মালুম হচ্ছিল না বরং একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব । সাধারণতঃ একটু বেশী গরম পড়লেই জাপানীরা কাহিল হয়ে পড়েন । তাই ট্যাক্সিতে চেপে অন্তরঙ্গতার সুরে ড্রাইভারকে বলেছিলাম, 'এ বছর গরমকালেও বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া বেশ মনোরম' । ড্রাইভার কিন্তু তাতে সায় না দিয়ে বললেন, 'আবহাওয়া মনোরম ঠিকই, কিন্তু ব্যবসা মনোরম নয়' । 'কেন ?' 'কারণ যে সব কাপড়ের দোকান এখন গরমকালের পোষাক বিক্রি করে পয়সা রোজগার করে তাদের বিক্রি প্রায় বন্ধ । তাছাড়া আমাদের রোজগারও কম' । 'তার কারণ'? 'তার কারণ খুব গরম পড়লে অনেকে সমুদ্র বা নদীর ধারে অনেক রাত পর্যন্ত কাটায় আর সাকে খায় । ফেরার সময় তারা ট্যাক্সি করে ফেরে । কিন্তু বৃষ্টি হলে, আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাব থাকলে তারা আর বাইরে বেরোয় না, আর সাকে খেয়ে অনেক রাত করেও ফেরে না । ফলে আমাদের রোজগারও কম'।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা শুনে মনে হল, সত্যিই তো ! আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচারধারা কিরকম একপেশে । কারণ সে বিচারের মাপকাঠি কেবল আমাদের ভাল লাগা – মন্দ লাগা, সুবিধা-অসুবিধা । তার ঊর্ধ্বে উঠে আমরা কয়জনই বা পরিস্থিতির বা মানুষের সম্বন্ধে সঠিক বিচার করি ।

যদিও ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সম্বন্ধে আমার আরও অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে । তার মধ্যে থেকে আর একটি বলে এ লেখার উপসংহার টানবো । সেবারও জুসি ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে আশ্রমে ফিরছিলাম । ড্রাইভারের সঙ্গে কথায় কথায় আমাদের দেশের কথা উঠলো । ড্রাইভার বললেন, 'জানেন, আপনাদের

দেশে আমার বোন যে কতবার গেছে তার ইয়ত্তা নেই'।

'কতবার'?

'অন্তত ২০/২৫ বার তো বটেই'।

'বলেন কি' !

"হ্যাঁ, প্রায় প্রতি বছরই তার ভারতে যাওয়া চাই । অথচ সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে ঝামেলাতেও পড়ে' ।

'কি রকম'?

ড্রাইভার বেশ রসিক লোক । মজা করে তখন তাঁর বর্ণনা শুরু হল, 'এই ধরুন বোন যদি কম পয়সার কোন হোটেলে ওঠে তাহলে দেখতে পাবে ঘরে ইঁদুর দৌড়দৌড়ি করছে' ।

'তারপর'?

'তারপর ট্রেনে যদি সাধারণ কামরায় ওঠে আর সঙ্গে মালপত্র থাকে তাহলে ঠিকমত খেয়াল না রাখলে হঠাৎ দেখবে তার দু একটি মাল উধাও'।

'আরও আছে নাকি'?

'বলছি । বোন একবার দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল দেখতে গিয়েছিল । নিয়ম আছে সবাইকে বাইরে জুতো রেখে সেখানে যেতে হবে । বোনও জুতো খুলে রেখে গান্ধীসানের সমাধিস্থল দেখতে গেল । কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখে তার জুতো জোড়া হাওয়া ! এদিক ওদিক বেশ কিছুক্ষণ খুঁজেও জুতো না পেয়ে অগত্যা খালি পায়েই হাঁটা শুরু করলো । একটুখানি হেঁটে দেখে রাস্তার ধারে একটি লোক কিছু নতুন-পুরানো জুতো বিক্রি করছে । কৌতূহলী হয়ে সেখানে যেতেই দেখে অনেক জুতোর মধ্যে তার জুতোজোড়াও সেখানে বিক্রি হচ্ছে । সে তখন দোকানের লোকটিকে বলল, ' এ জুতো জোড়া তো আমার'! লোকটির উত্তর, 'আমি তার কি জানি ! একটি লোক আমাকে ওটা বিক্রি করেছে'। বোন আর কি করবে ! জুতো ছাড়া চলাও মুশকিল্ । অগত্যা তার জাপানে কেনা জুতো জোড়াটিকে ভারতে এসে তাকে আর একবার কিনতে হল'!

ড্রাইভার বেশ রসিয়ে রসিয়ে এসব গল্প করছেন, আর আমিও খুব হাসছি । এরপর হাসি থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা বলতে পারেন ভারতে এত ঝামেলায় পড়েও কেন আপনার বোন সেদেশে বার বার যান'?

'ঠিক ! আমিও তাই ভাবি । অথচ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কোন উত্তরও দেয় না'।

যে উত্তর ড্রাইভার জানেন না, তার বোনও বলেন নি, আমরা তা খানিকটা অনুমান করতে পারি ।

ড্রাইভারের সেই বোনই একমাত্র নন, এমন বেশ কিছু বিদেশী আছেন যাঁরা ভারতকে ভালোবাসেন এবং ঐ দেশে বারংবার যান বা যেতে চান । উন্নত দেশের সাথে তুলনা করলে ভারতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তীতার অভাব, চারিদিকে হৈ হট্টগোল, দারিদ্র ও অশিক্ষা – এ ধরণের বেশ কিছু নেতিবাচক জিনিষ থাকলেও ভারতের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার আকর্ষণ বিপুল । তারা যখন ভারতবর্ষে যান, তখন এমন একটা অতীন্দ্রিয় কিছু পান, এমন একটা প্রশান্তি পান, যা তারা ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন না । ভারত ভ্রমণে গিয়ে যে সব বিদেশী ভারতের তথাকথিত 'কালচারাল শক্' মানিয়ে নিতে পারেন এবং যাঁদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও কিছুটা আছে তাঁরা ভারতের সেই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান ।

ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও মহত্ত্ব, কোলাহল সত্ত্বেও নির্জনতা, অশান্তির অনেক কারণ থাকা সত্ত্বেও শান্তি, অমার্জিত ব্যবহার সত্ত্বেও দয়ালুতা, দারিদ্র্য সত্ত্বেও অন্তরের ঐশ্বর্য্য ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য । গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যে ভূমার এমন নিবিড় উপস্থিতি, এমন আর কটি দেশে আছে ? নদীর তীর, সমুদ্র সৈকত, পাহাড়-পর্বত দেশে দেশে কতই না আছে, কিন্তু কাশীর গঙ্গার ঘাট, যমুনার গঙ্গাতীর ?, প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, হৃষীকেশ থেকে দেখা হিমালয়ের অনন্ত বিস্তার, কোনারকের সূর্যমন্দির, পুরীর সমুদ্রতটে সেই ভূমার অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায় – যা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, দেশী-বিদেশী সকলের চোখেই কিছুটা হলেও ধরা পড়ে ।

ভারতের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এত বেশী যে এদেশে বারবার গেলেও তা কখনও পুরানো হয় না । তার মধ্যে সবসময়ই নূতন কিছু দেখার মত জিনিষ থাকে । অথচ ভারতের এত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বও আছে । আর এই সব বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপ 'Indiaর Indianness' । অনুভবী বিদেশী ভ্রমণার্থী ভারতে গিয়ে তাই এমন কিছুর সন্ধান পান যা তাঁরা ভাষায় হয়তো বর্ণনা করতে পারেন না, কিন্তু অন্তরে তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন আর তারই টানে তাঁরা বারবার এখানে ফিরে আসেন । কেউ কেউ দীর্ঘকাল থেকেও যায় ।

রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা ও লেখক পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে, যিনি পরে মঠ মিশনের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন, কাশীতে এক পাশ্চাত্ত্যের মহিলার সঙ্গে দেখা হয় । সেই মহিলা তাঁকে বলেন তিনি সেখানে গঙ্গার ধারে একটি ফ্ল্যাট-এ প্রায় বিশ বছর আছেন ও সাধন-ভজন করছেন । পূজনীয় মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কি করে কাশীর মত ঘিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন শহরে এতদিন আছেন ? মহিলাটি উত্তর দিয়েছিলেন, 'I do not see those things. I only experience the great spiritual atmosphere of this city.'

আমার বিশ্বাস পূর্বকথিত জাপানী ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভারত-প্রেমিক বোন ঐ পাশ্চাত্ত্যের মহিলার দলেই পড়েন !

অঞ্জলি লহ মোর ভঙ্গিতে

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

৩শে জুন, ২০১২ । Indian Classical Dance Troupe, Japan-এর ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান । মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রম । যেন পুজো আসছে । আর আমরা কোন সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোক্তা, কর্তৃপক্ষ ।

প্যান্ডেল কেমন হবে (এখানে স্টেজ), নৈবেদ্যতে কি কি থাকবে (এখানে নাচের আইটেম), তাই নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা । নতুন নতুন পোষাক তৈরী হচ্ছে । কোনটাতে চুমকি লাগানো হচ্ছে । কোন শাড়ীতে পুরনো পাড় খুলে নতুন পাড় লাগানো হচ্ছে । সর্বাঙ্গীন সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগা ।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি হচ্ছে । রোজই কিছু না কিছু মেল আসছে টিকিটের খোঁজে । তারই মধ্যে হঠাৎ একটা মেইল পাই ১১ই আগষ্ট ফাঁকা আছি কিনা তা জানতে । একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কথা বলতে চান, আর কোন বিশদ লেখা নেই । তাড়াতাড়ি schedule book চেক করে জানিয়ে দিই আমি ফাঁকা ওই দিন । তারপর দিনই আবার মেইল আসে বিশদ জানিয়ে । জায়গার নাম দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়না কিছুতেই । বার বার করে পড়ি মেইলটা । কম্প্যুটারের সামনে থ হয়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ । নারার তো-দাইজিতে অনুষ্ঠান । জাপান তথা পৃথিবীর ঐতিহ্য তো-দাইজি, সেখানে নৃত্যানুষ্ঠানের ডাক । ভাবা যায় ? মনের আনন্দে কেবলমাত্র জুনের সঙ্গেই শেয়ার করি আপাতত । উঠেপড়ে লাগি পুজোর কাজে, মানে আমাদের ১৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে ।

২২শে জুনের ঝড়বৃষ্টির পর ২৩ তারিখ আকাশ ঝল্‌মল্ করে । হল ভর্তি দর্শক । Troupe-এর প্রতিটি মেয়ের নিষ্ঠাভরে নৃত্যনিবেদনে পূজা হল সমাপন ---- ।

এরই মধ্যে মনে মনে বেছে নিই ৬জন মেয়েকে তো-দাইজির জন্য । সেদিন হল থেকে বাড়ি ফিরেই মেইল পাঠাই পর পর ৬জনকে । আমারই মত অবস্থা প্রত্যেকের । কারুর গায়ে কাঁটা, কারুর চোখে জল ।

দুটো অনুষ্ঠান একই দিনে । প্রথমটা তো-দাইজি মিউজিয়ামে দুপুরে । পরেরটা তো-দাইজি মন্দিরের সেন্ট্রাল গেটে Toudaiji light-up promenade concert, রাতে ।

দুপুরের অনুষ্ঠান শেষ হতে ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে নারা পার্কের হরিণদের সঙ্গে খেলতে খেলতে পৌঁছে যাই মূল মন্দিরের সামনে । আমরা ছুটলে হরিণরাও ছোটে । আবার আমরা থামলে ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ে । কি মজা !!! নারা-সরকার ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করে । সারাদিন ছাড়া থাকে । মনের সুখে বেড়ায় এদিক-ওদিক । ওদের জন্য খাবার বিক্রি হয় । অনেকেই খাবার কিনে ওদের খাওয়ায় । ওরা খেয়েই একবার করে মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দেয় । Training ! সন্ধ্যে হতেই এক এক করে ফিরে যায় নিজেদের আস্তানায় । সেদিন রাতে গাড়িতে ফিরতে গিয়ে প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়াতে হল সিগ্‌ন্যালের আলো সবুজ থাকা সত্বেও । তিন হরিণ-শাবক আর তাদের মা ধীরে-সুস্থে রাস্তা পার হল । এত আমার পরিচিত দৃশ্য ! বাঘাযতীন মোড়ে এক্কেবারে রাস্তার মাঝখানে মস্তবড় এক ষাড়ের নির্লিপ্তে বসে জাবরকাটা, আর ৪৫ নম্বর বাসের কান ফাটানো হর্ণ ...।

"তো-দাইজি"

সে ইতিহাস ১২৬০ বছর আগের । জাপানী বছর তেম্-পো-শো-হো ৪ । ৭৫২ সন । ভারত থেকে আসেন বৌদ্ধগুরু বোদাইসেন্না বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজে তারও প্রায় ১০ বছর আগে । তিনিই এই তো-দাইজি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে ভগবান বুদ্ধের চোখ এঁকে দেন । কিভাবে সেই চোখ আঁকা হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে । কেউ বলেন ওই ৫০ মিটার উঁচু বুদ্ধের চোখ আঁকার জন্য পাশ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল । আবার কেউ বলেন ছাদ থেকে বৌদ্ধগুরু বোদাইসেন্নাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর উনি ঝুলন্ত অবস্থায় চোখ এঁকেছিলেন । শোনা যায় চোখ আঁকার সেই তুলির সঙ্গে এক লম্বা দড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল । সেদিনের সেই সেরিমোনিতে উপস্থিত ১০০০০ জন অতিথির মধ্যে অনেকেই সেই দড়ি স্পর্শ করেন ।

রথযাত্রার দিন রথের রশি স্পর্শ করতে পারলে আমরা ভারতীয়রা যেমন ভাবি পুণ্য হয়, সেদিন ও হয়ত তেমনি ছিল ।

১১৮০ সনে একবার, ১৫৬৭ সনে একবার, দু-দুবার আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় তো-দাইজি । আবার নতুন করে তৈরি হয় জাপানী এদো পিরিওডে ১৭০৯ সনে ।

কি দিয়ে অঞ্জলি দেব ভগবান বুদ্ধের পায়ে ভাবতে থাকি । অহিংসাবাদের জনক মহাত্মা গান্ধীর বাণী "বৈষ্ণব জনতো" দিয়ে শুরু হয় আমাদের পূজা । মাথার ওপর জোড় হাত করে যখন

আলোয় ঝলমলে তো-দাইজির সামনে দাঁড়াই বিদ্যুৎ খেলে যায় সারা শরীরে । শেষ হয় মঙ্গলম দিয়ে ।

"ভূমি মঙ্গলম্, বায়ু মঙ্গলম্, জীব মঙ্গলম্, সূর্য মঙ্গলম্, চন্দ্র মঙ্গলম্, দেহ মঙ্গলম্, মন মঙ্গলম্, জগত মঙ্গলম্, আত্মা মঙ্গলম্, সবার মঙ্গল কামনা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ।

শেষ হয়েও হয়না শেষ, ঘোরের মধ্যে কেটে যায় আরও কয়েকটা দিন ...

[Indian Classical Dance Troupe, Japan is an Institution of Bharatnatyam and Udayshankar Style of Creative Dance.
Artistic Director: Subha Kokubo Chakraborty
Email: gharebaire@gmail.com, Website: http://www2u.biglobe.ne.jp/~india/home10.htm]

ভাইজাগ আর আরাকু ভ্যালি

- সুপ্রভা কুমার

ভাইজাগ বা বিশাখাপতনম অন্ধ্রপ্রদেশের দ্বিতীয় এবং ভারতের পূর্ব উপকূলের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। করমণ্ডল এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে দুটো পঞ্চাশে ছেড়ে পরদিন ভোর চারটে পঁচিশে আটশোষাট কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ভাইজাগ পৌঁছে যায়। ভাইজাগ স্টেশন সুন্দর সাজানো-গোছানো। অন্ধ্রপ্রদেশ টুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের একটি হোটেল বুক করা ছিল এবং তারা একটি গাড়িও স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হোটেল স্টেশন থেকে বেশ দূরে সমুদ্রতীরে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সকাল হয়ে গেল।

হোটেলে পৌঁছে একটু বিশ্রাম করে বেলার দিকে বেরলাম দেখতে সীমাচালম মন্দির। মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে। উপরে ওঠার পথে গাড়ি থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাথরের তৈরি মন্দিরটিতে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের চিহ্ন সর্বত্র। মন্দিরটিতে ভিড় খুব একটা নেই, ভিতরে এয়ারকণ্ডিশন থাকা সত্ত্বেও বেশ গরম। টিকিট কেটে পুজো দিতে হয়।

সীমাচালম থেকে নামার সময় পড়ে কৈলাশগিরি পাহাড়, যার উপরে একটি পার্ক আছে। গাড়ি রোপওয়ে স্টেশনের সামনে থামল। স্টেশন থেকে রোপওয়ের টিকিট কেটে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগে দুই তিন মিনিট। পাহাড়ের উপর থেকে ভাইজাগ শহর আর নীল সমুদ্রের রূপ আরও ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। পাহাড় থেকে নেমে গাড়ি চলল সাবমেরিন মিউজিয়ামের দিকে। এখানে একটি পুরানো সাবমেরিনকে মিউজিয়ামে পরিবর্তন করা হয়েছে। মিউজিয়ামের ভিতরে ঢুকলে সমুদ্রের নিচে থাকা যে কত কঠিন, তা অনুভব করা যায়। সাবমেরিন মিউজিয়ামের পাশে একটি মেরিন মিউজিয়াম থাকলেও, সেখানে যাবার সময় ছিল না। ডলফিন নোজ আর পোতাশ্রয় দেখে ফিরে আসা হল হোটেলে।

পরদিন সকাল সাতটার ট্রেনে ভাইজাগ স্টেশন থেকে সবাই রওনা দিলাম আরাকু ভ্যালি। প্রাতঃরাশ সারা হল ট্রেনেতেই। আরাকু ভ্যালি ট্রেনে যাওয়ার অন্যতম কারণ ট্রেনের টানেল। প্রায় একচল্লিশটা টানেল আর অগুনতি ব্রিজ পড়ে আরাকু ভ্যালি যাওয়ার পথে। এই ট্রেন লাইন তৈরি হয়েছিল লোহার আকরিক ছত্তিশগড় থেকে ভাইজাগের ইস্পাত কারখানা পর্যন্ত আনার জন্য। কয়েকটি ছোট স্টেশন পার হয়ে ট্রেন পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। আরাকু ভ্যালি যাওয়ার পথে উপত্যকা পড়ে ডানদিকে আর বামদিকে দেখা যায় ঝর্ণা। দার্জিলিং-এর পাহাড়ী ট্রেন ন্যারো গেজ লাইন হলেও এই ট্রেন কিন্তু ব্রড গেজ লাইন। ট্রেনে যাবার সময় পড়ে শিমিলিগুড়া স্টেশন, যেটি ব্রড গেজ লাইনে দেশের উচ্চতম স্টেশন (যদিও দার্জিলিং-এর ঘুম স্টেশন এখনও সব রকম লাইনের মধ্যে দেশের উচ্চতম স্টেশন)। ট্রেন থেকে দেখা যায় কফির বাগান, সবুজ উপত্যকা, ঝর্ণা আর নদীর সঙ্গম দেখে মনে হয় ভারতবর্ষে কী নেই যা অন্য দেশে আছে! ট্রেন অনেকগুলি টানেল পার হয়। সেগুলোর মধ্যে সবথেকে লম্বা টানেলটি প্রায় পাঁচশো মিটার। আঁকাবাঁকা পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝে ট্রেনের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনটিকে দেখা যায় টানেলের মধ্যে ঢুকতে আর বেরতে। চিমীদিপল্লী স্টেশন পার হবার পর ঝর্ণা আসে বামদিকে। ট্রেনে যেতে যেতে মাঝে মাঝে দেখা যায় ভারতীয় রেলের কর্মচারীর পতাকা হাতে ট্রেনকে

সংকেত দেখাতে।

ট্রেন আরাকু ভ্যালি পৌঁছায় প্রায় এগারটার সময়। প্রথমে গেলাম একটি উপজাতি মিউজিয়ামে। এই মিউজিয়ামে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপজাতিদের জীবনযাত্রার প্রচুর সামগ্রী দ্রষ্টব্য। এর পরে গেলাম আদিবাসীদের নাচের অনুষ্ঠানে। নাচের শেষের দিকে প্রায় সকলকেই দেখলাম উঠে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তার পরে বাসে করে গেলাম বৌড়া কেভস্-এ। স্টালাকটাইট আর স্টালাগমাইট-এর কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম প্রকৃতির অপূর্ব কীর্তি।

এর পরে বাসে করে ফেরা হল ভাইজাগে। যদিও আরও কিছু দিন থাকা হয়েছিল ভাইজাগে, তবু স্মৃতি রোমন্থন করলে এই কয়েকটি দিনই ভেসে আসে বারে বারে।

আকবর বাদশা

- তপন কুমার রায়

কথায় বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় । হঠাৎ ঠিক করলাম আকবর বাদশার এক সময়ের ডেরা ফতেপুর সিক্রী দেখতে যাব । ক'দিন আগে এক বেলজিয়ান সাংবাদিক Dirk Collierএর লেখা An Emperor's Writing পড়ে কেমন যেন আকবর বাদশার ফ্যান হয়ে গেলাম । বাদশা নিজে নিরক্ষর ছিলেন । লেখক বাদশার লেখা গোটা চল্লিশেক কাল্পনিক চিঠি দিয়ে একটা fiction লিখেছেন । এর মধ্যে প্রায় সবই জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমকে লেখা, দুটি ওঁর প্রথমা বেগম মারিয়াম-উজ-জামানিকে । ছোটবেলায় সেই ইতিহাস পড়ার সময় থেকেই আকবর বাদশার ওপর কেমন যেন একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল । মনে হয় রবি ঠাকুরেরও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু ছিল । নইলে হরিপদ কেরাণীর চরিত্র সৃষ্টি হত কিনা সন্দেহ আছে ।

আমাদের ইচ্ছে হল এবার আগ্রাটা ঘুরে আসা যাক । কম্পিউটার খুলে অন্তর্জালে টিকিট করতে গিয়ে দেখি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্রিতলিকা ছাড়া আর সবই অমিল । গিন্নীর সায় মিলল । শেয়ালদা থেকে আজমীর শরীফ এক্সপ্রেস একুশে জানুয়ারী রাত এগারটা কুড়িতে ছাড়বে । শীতের সন্ধ্যে । বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে দুজনে স্টেশনে পৌঁছে দেখি দুজন কুলি হাসতে হাসতে বলছে 'কোহরা কি কারণ সে টিরেন দো ঘন্টা দের সে ছুটেগি' । তারা আরো জানাল যে আমরা নাকি ভাগ্যবান কারণ গত এক সপ্তাহে কোন দিনই ভোরের আগে ছাড়েনি । অর্থাৎ যা দাঁড়াল আমাদের ঘন্টা তিনেক স্টেশনে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই । প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি বেঞ্চিগুলো সব ভর্তি । অতএব দুটি রাস্তা, দাঁড়িয়ে থাকা নতুবা শুয়ে পড়া । দ্বিতীয়টা বেছে নিতে মন চাইল । স্টল থেকে একটা বাসি কাগজ কিনে মেঝেতে পাতবার তোড়জোড় করতে দেখে একটি হকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের জন্য দুটো ফোলানো বালিশ আড়াইশো টাকার বিনিময়ে দিতে চাইল । দরদাম করে নিয়েই ফেললাম । ফুলিয়ে টুলিয়ে ও রেডি করে দিল । প্ল্যাটফর্মের মেঝের ওপর সুন্দর করে গুছিয়ে গাছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা জীবনে এই প্রথম । আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান নিষেধ হওয়ায় আমি যথেষ্ট অসুবিধেয় পড়লাম । সারা দিনের ক্লান্তি আমাদের চোখ বেশীক্ষণ খুলে রাখতে দিল না । জীবনে প্রথম একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, ঘুম পেয়ে গেলে পরিবেশ কোন ব্যাপারই নয় । তবে প্ল্যাটফর্মের ঠাণ্ডা মেঝেয় শিরদাঁড়া মোটামুটি অবশ হয়ে গেল । আমাদের যাদের ছেলেমেয়েরা দেশের বা শহরের বাইরে থাকে, মৃত্যুর পর তাদের নিদেনপক্ষে এক রাত্রি মর্গবাস নিশ্চিত । জীবিত অবস্থায় সে অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেল । হঠাত্ সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, 'আ গয়ি... আ গয়ি...' । চোখ খুলে দেখি একটা বেশ পুরোন ইঞ্জিন পেছনে এক সার কামরা টেনে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে । ঝেড়ে উঠে আমাদের কামরা খুঁজে জায়গা দখল করে আবার একটা ঘুমের ব্যবস্থা করে ফেললাম ।

পরদিন ট্রেন সন্ধ্যা সাতটার জায়গায় আগ্রা ফোর্ট পৌঁছাল রাত দশটার কিছু পরে । যাত্রীর তুলনায় যান একবারেই অপ্রতুল । তার মধ্যে তিন চাকার প্রাধান্যই বেশী । যথারীতি আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী মধ্যসত্ত্বভোগীর অভাব হয় নি । সে আমাদের মাল দুটো একটি কুলির হাতে দিয়ে একটা অটোওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তার চলমান ফোনের সাহায্যে আমাদের হোটেল পর্যন্ত ঠিক করে দিল এবং এর জন্য কোন পারিশ্রমিকের আশা করে না সেটাও জানিয়ে দিল ।

অত রাত্রে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে আমাদের নানা রকম অন্ধকার রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ভূশণ্ডীর মাঠে তিন তলা বাড়ী দেখিয়ে বলল এটাই আমাদের হোটেল । তাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি কোট-টাই পরিহিত একটি যুবা আমন্ত্রণ ডেস্কের উল্টো দিকে চলে গেল এবং আমার পিতৃপরিচয় ছাড়া আর সমস্ত বৃত্তান্ত তার খাতায় লিখতে বলল । একটি বালখিল্য ওর আদেশ অনুযায়ী আমাদের তিন তলার একটি কামরায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেল । সে এও জানাল যে বাথরুমে গরম জল নেই, তার কারণ ওদের জল গরম করার একমাত্র উপায় হল রবি-কিরণ যা সেদিন সূর্যদেব না ওঠার জন্য সম্ভব হয় নি । দেখতে দেখতে প্রায় মাঝরাত হয়ে এল বলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা স্টেশনে কেনা বিস্কুট আর মিনারেল ওয়াটার পান করে কম্বলের তলায় যাবার বন্দোবস্ত করলাম । তখন বাইরের তাপমান বোধহয় শূন্যের কাছাকাছি ছিল ।

সকাল হতে কিছু অর্থের বিনিময়ে সেই বালখিল্য আমাদের জন্য দু বালতি গরম জলের বন্দোবস্ত করে উদ্ধার করল । ঘড়িতে তখন দেখি সকাল সাতটা । দেরী না করে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে আমাদের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নজর করার চেষ্টা করলাম, কারণ অত রাতে কিছুই ঠাহর করা একরকম অসম্ভব ছিল । বাইরে তখন মিষ্টি রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে । আর তার চেয়েও মিষ্টি লাগল কয়েকটা চার চাকার গাড়ী দেখে । একজন বয়স্ক ড্রাইভার গাড়ীর বাইরে পায়চারী করে রোদ পোহাচ্ছিল । তাকে আমাদের অসহায়তার কথা জানানোতে সে আমাদের শহরের মধ্যে একটা মধ্যবিত্ত হোটেলের ব্যবস্থা করে দেবার শর্তে তার সঙ্গে ফতেপুর নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেললাম । দৌড়ে ওপরে গিয়ে গিন্নীকে সমস্ত তথ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি প্যাক করে নিচে এসে চেক আউট করলাম ।

নতুন হোটেলে গিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে বেরোতে প্রায় দশটা বেজে গেল । গাড়ী দু নম্বর হাইওয়ে ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে আমাদের গন্তব্যে নিয়ে চলল । জয়পুর থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার আগে ফতেপুর সিক্রী । একজন গাইড সঙ্গে নিলাম । নহবত্ খানা, বিভিন্ন গেট, তানসেন ব্রাদরি, খাজানা বা টাঁকশাল পেরিয়ে আসল প্যালেস । দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, আকবরের প্যাভিলিয়ন যেখান থেকে উনি আম জনতাকে দর্শন দিতেন, সব জায়গা গাইডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম । পাথর কেটে ওরকম জালি এখনও কি সুন্দর রয়েছে । দেওয়ানী খাসের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখে প্রথমে মনে হয় দোতলা স্ট্রাকচার । আসলে একটা সেন্ট্রাল কলামের ওপর চার দিকে বীম ছড়িয়ে গেছে আর তার মাঝে বিরাট উঁচু একটা সিলিঙের তলায় একটা বিশাল হলঘর । এটি চার ভাগে ভাগ করা । চারটি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কথা উনি মাঝে বসে শুনতেন । কোলিয়ার সাহেবের মতে এই জায়গার নাম ইবাদৎ । এখানে বসেই ওনার দীন-ই-ইলাহী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা মাথায় আসে । এই ধর্মের স্তম্ভ ছিল হিন্দু বা খৃষ্টান ধর্মের মত ট্রিনিটী ।

বাইরে বেরিয়ে এসে বিরাট চত্তর পার হওয়ার সময় দেওয়ানী আমের মাঝখানে যে জায়গাটা রয়েছে, সেখানে একটা গোল পাথর দেখিয়ে আমাদের গাইড বলল ওটায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের মাথা রেখে হাতীর পায়ের তলায় পেষা হত । ব্যবস্থাটা খুব ভাল ছিল না তা এক কথায় বলা যায় । তবে এই সব গাইডদের তথ্য কোত্থেকে জোগাড় হয়েছে, সেও অজানা ।

যোধাবাঈ প্যালেসের মূল ফ্যাসাড চোখ জুড়ানো শিল্প । আকবর তার রাজপুত রানীর সম্মানার্থে ভেতরে একটা কৃষ্ণ মন্দির স্থাপন করেছিলেন । এই রানী তাঁর প্রথম সন্তান সেলিমের জন্ম

দিয়েছিলেন । কোলিয়ার সাহেব অবশ্য এনাকে যোধাবাঈ বলতে অনিচ্ছুক । কারণ এনার যোধপুরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না । এনার প্রাক্ বিবাহ নাম জানা যায় না । বিবাহোত্তর নাম ছিল মারিয়াম-উজ-জামানি অর্থাৎ সর্বকালের মেরী । এই নাম রাখার পেছনে কি আকবরের শৈশবে খৃষ্টান ধর্মের কোন প্রভাব কাজ করেছিল ? ওনার বাবা হুমায়ুন প্রথম পানিপথ যুদ্ধে পরাজিত হবার পর কিছু দিন সম্ভবত ইউরোপে কাটিয়েছিলেন । এই প্রাসাদের একধারে রান্নাঘর, বেগমের হামাম ইত্যাদি । এই প্যালেসের বাইরে সব কটা দেয়াল দুটি পাথরের, যার মধ্যে ফাঁক আছে । এতে গরমের থেকে একটা স্বাভাবিক ইন্সুলেশন থাকে । বেশী গরম হলে নাকি মাঝখানে জল ঢালা হত । যাইহোক, সব কিছু দেখতে গেলে অন্তত মাসখানেক বইপত্তর নিয়ে থাকতে হবে । সে সাধ্য আর সময় আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোথায় !

এর পর গেলাম সেলিম চিস্তির দরগায় । আকবর সন্তানহীন ছিলেন বিয়ের পর বেশ কিছুদিন । উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি যখন যথেষ্ট চিন্তিত, সে সময় সেলিম চিস্তি ভবিষ্যত বাণী করেন যে উনি তিন সন্তানের জনক হবেন । কিছুদিনের মধ্যে সেলিমের জন্ম হলে

বাদশা চিস্তির ভক্ত হয়ে পড়েন ।

এই দরগা এবং স্থাপত্য শৈলী আকবরের প্রথম জীবনের প্রথাগত ধর্মের চাইতে সুফি ধর্মের ওপর বিশ্বাসের প্রকাশ । এখানে অন্যান্য সব লাল পাথরের শিল্প হলেও এই দরগা কি করে সাদা মার্বেলের হল জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম এটা নাকি পরে শাহজাহান পরিবর্তন করেছিলেন । ওনার মার্বেলের প্রীতির কথা

তো সর্বজনবিদিত ! শেখ সেলিমের দরগায় চাদর চড়ালাম ।

ওখানকার সেবকরা আমাদের সেই ছবিও তুলে নিলেন । একটা সুতো দিয়ে বললেন ধারের একটা জানলার জালিতে বেঁধে আসতে এবং সেই সময় জীবনের কোন মনস্কামনা থাকলে মনে মনে বলতে । সেটা নাকি পূরণ হতে বাধ্য । ভাবলাম কি চাইব ... টাইম মেশিনে চড়ে একবারটি আকবর বাদশার দরবারে তানসেনের গান, বীরবলের রসিকতা আর হারেমের সৌন্দর্য দেখতে পাই তো বেশ হয় । সঙ্গে অবশ্য স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে শ্যামল, সমীর, অসমঞ্জ এরা থাকলে আরো ভাল হয় ।

বাইরের বিশাল বুলান্দ দরওয়াজা, জামী মসজিদ, বাদশাহী

দরওয়াজা । সবই লাল পাথরের ওপর অপূর্ব শিল্পকলা । পাথরের স্তম্ভ থেকে সিলিঙের ওপর বিচিত্র কারুকার্য, ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থেকেও আশ মেটে না ।

দেখতে দেখতে কখন চার ঘন্টা কেটে গেছে খেয়ালই হয় নি । গাইডকে তার পারিশ্রমিক মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম । আমাদের সারথি কুশল প্রশ্ন করল এবং আমাদের সব ঠিকঠাক দেখা হয়েছে কি না খবর নিল । ও বলল, 'চলিয়ে আপকো এক আচ্ছা জাগাহ লে চলতে হ্যায় দুপহরকা খানা কে লিয়ে' ।

খাওয়া দাওয়া সেরে পরের দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ড্রাইভারকে বিদায় জানালাম । হোটেলে এসে সারাদিনের নোট লিখে বিশ্রাম ।

পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে সারথি এসে হাজির । আমাদের গন্তব্য ছিল সিকান্দ্রা, বাদশার কবরখানা । আগ্রা ছেড়ে দু নম্বর জাতীয় পথ ধরে মথুরার দিকে । বিশাল জায়গা জুড়ে সুন্দর বাগান ঘেরা একটা অপূর্ব স্থাপত্য হল এই সিকান্দ্রা । বাগানের মাঝে মস্ত এক গেট । সেটা পেরিয়ে মূল স্ট্রাকচার । বাগানের মাঠে প্রচুর হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল । এত বড় জায়গাটা কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছে । কাগজ-প্লাস্টিক দূরস্থান, একটা শুকনো পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই । গেট পেরিয়ে মূল বাড়ীটিতে প্রবেশের জন্য একটা লম্বা করিডর । সেটা পেরিয়ে মস্ত উঁচু সিলিংয়ের নিচে বাদশার কবর উত্তর-দক্ষিণ অবস্থায় । ওপরে উঁচুতে একটি বিশাল ডোম । সঙ্গের সেবক পরিষ্কার গলায় আজানের সুরে 'আল্লাহ হো আকবর...' বলল । সুরটি অনেকক্ষণ ধরে গম্‌গম্ করে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল । এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা । শান্ত পরিবেশে মনে হল ঠিক যেন সেই যুগে ফিরে গিয়েছি । সে সময় ওখানে বেশ কিছু লোক ছিল । অবাক লাগল কেউ একটা শব্দ করে নি পাছে জায়গাটার পবিত্রতা নষ্ট হয় । পরিবেশটাই এমন যে এর জন্য কোন সরকারি নোটিস জারি করার প্রয়োজন হয় নি । মূল জায়গাটির দু'পাশে দুটি ঘরে ওনার বেগমদের কবর । অবাক লাগল সেখানে কারো নাম লেখা নেই । একবার মনে হল জাহাঙ্গীর আকবরের মৃত্যুর পর ওনার সাধের আগ্রা ফোর্ট থেকে এত দূরে কেন কবর দিয়েছিলেন । ইতিহাসবিদ্‌রা বাদশার মৃত্যু নিয়েও অনেক জল্পনা করেন । অত দোর্দন্ডপ্রতাপ বাদশার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পেটের অসুখে মৃত্যু অনেকেই অস্বাভাবিক মনে করেন ।

বেরিয়ে এসে সারথি বলল হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় সে আমাদের আগ্রা ফোর্ট দেখার আগে মথুরা ঘুরিয়ে আনতে পারে ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না । ঘন্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম । ড্রাইভার বলল ওখানে ক্যামেরা, মোবাইল ঢুকতে দেবে না । সেগুলো গাড়িতে ওনার জিম্মায় রেখে আমরা মন্দিরের মূল গেটের সামনে লাইনে দাঁড়ালাম । নারী এবং পুরুষের আলাদা লাইন কেন যে করে ভগবান জানেন । দু দফা চেকিং করে পার পাবার পর ভেতরের এক নরপুঙ্গব আমার ব্যাগ আরেক দফা দেখতে চাইলেন । টাকা-পয়সা টিকিট ছাড়া আরেকটি জিনিষ সম্বন্ধে ওনার আপত্তি জানালেন । জিনিষটি হল একটি পেন-ড্রাইভ । ক্যামেরার ডিস্ক ভর্তি হয়ে গেলে ওতে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা । সেই নরাধম আগে জিনিষটি দেখার অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন । আমি বললাম 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' । কে বোঝাবে যে যন্ত্রটির ব্যবহার ছাড়া আমি ওর সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানি না । আমার অবস্থাটা অনেকটা মার্কিন মুলুকে বাফেলো এয়ারপোর্টে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে প্যাঁচে পড়ার মত । ওটা যে নিরীহ ওষুধ, সেটা বোঝাতে গলদঘর্ম হতে হয়েছিল । এবার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন । শেষ কালে পেয়াদা ছেড়ে এক হাবিলদার আমাকে বাঁচাল । তার ছেলে নাকি 'কম্প্যুটারকা এস্পার্ট' । যাই হোক, যতক্ষণে আমাক আবার একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে টোকেন দিয়ে পেন ড্রাইভ ছাড়া ঢুকতে দিতে রাজী হল ততক্ষণে মূল মন্দির ছাড়া আর সব দুপুরের জন্য বন্ধ । কারাগারে যেখানে ভগবানের জন্ম, সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করলাম দেবকি এসে আরেক দফা যেন ওনাকে কংসের কারাগার থেকে উদ্ধার করেন । যিনি মহাভারতে নেই নেই করে আঠারোটা অধ্যায় কপচে কুরুক্ষেত্র করে দিয়েছিলেন, তাকে সামলাবার জন্য এই ব্যবস্থা ? মন্দিরটি আকারে বিরাট । কিন্তু এর স্থাপত্যে কোন বিশেষত্ব একেবারেই চোখে পড়ল না । এতে ইতিহাসের কোন চিহ্ন নেই । কয়েকটা বড় বড় পাথর নিয়ে এসে একটা মন্দির যেন করতে হয় বলে করা । গুটি গুটি বাইরে বেরিয়ে সেই পেন ড্রাইভটি ফেরৎ নিয়ে গাড়িতে চেপে বসা । আমাদের সারথি 'কিসেনজী'র মন্দির আমাদের ভাল লাগেনি শুনে একটু হতাশ হল বলে মনে হল । যাইহোক, ওখানে একটা খাবার দোকানে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে আমরা বললাম, 'সিধা আগ্রা ফোর্ট চলিয়ে' ।

প্রায় বিকেল হল আগ্রা ফোর্ট পৌঁছতে । মানুষ এবং ক্যামেরার টিকিট করে ভেতরে ঢুকলাম । বাদশার প্রথম প্রজেক্ট ছিল এটাই (১৫৬৫ থেকে ১৫৭৫)। এর পর জাহাঙ্গীর আর তার পর শাহজাহান আরো কিছু যোগ করেন ।

আকবরী মহল, জাহাঙ্গীর মহল, দিওয়ানী খাস, দিওয়ানী আম, মুসম্মান বুর্জ, শীষ মহল, মোতি মহল, দিল্লী দরোয়াজা, মীনা বাজার ইত্যাদি মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্পের এক অসাধারণ ঐতিহ্য ।

এর ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় নিজেকে ইতিহাসের অংশ মনে হয় । মুসম্মান বুর্জে শাহজাহান ১৬৬৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । জীবনের শেষ আট বছর গৃহবন্দী । সঙ্গী একমাত্র কন্যা জাহানারা । আপনজন বলতে আর কেউই নেই । উল্‌টো দিকে যমুনা পাড়ে নিজের সৃষ্টি তাজমহল । ওনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পর ওনার দেহ নৌকা করে যমুনা পার করে তাজমহলে মুমতাজের পাশে শায়িত করা হয় । তাজমহলের সবকিছু সিমেট্রিকাল একমাত্র ওনার নিজের কবর ছাড়া । ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না । ঔরঙ্গজেবের মরদেহ অধুনা মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে এক কোণে । বাবর-হুমায়ুনের পর আকবর যা শুরু করেছিলেন, শাহজাহান তাকে চূড়ান্ত উচ্চতায় নিয়ে যান । বঙ্কিমবাবু রাজকাহিনীতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায় নিয়ে ভারী সুন্দর একটা উপন্যাস লিখেছিলেন ।

আকবরের নাম নিয়ে কোলিয়ার সাহেবের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা – Observe the letters of this august name, how equitably proportioned and distributed are the four elements of the Universe –

alif is fire, kaf the water
ba is air and ra is earth .

এই চারটি শব্দের সংমিশ্রণে আকবর শব্দটি তৈরি । এর অর্থ হল সর্বশ্রেষ্ঠ । এই নামের মানুষকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরাজিত করতে পারবে না । আমাদের হিন্দুধর্মের পঞ্চভূতের মত ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শরীরের চারটি প্রধান উপাদান ।

দু দিন হয়ে গেল । হোটেলে ফিরে আমার একমাত্র কাজ দাঁড়াল একটা ট্র্যাভেল এজেন্ট ধরে কালকের মধ্যে বেনারসের টিকিট করা । আগ্রায় আকবর বাদশার ডেরা দেখে মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল ।

One day Emperor Akbar was inspecting the law and order situation in the kingdom. One of his ministers, who was jealous of Raja Birbal, complained that the Emperor gave importance only to Birbal's suggestions and all the otherministers were ignored.

Akbar wanted the minister to know how wise Birbal was.

There was a marriage procession going on.

The Emperor ordered the minister to enquire whose marriage it was. The minister found out and walked towards the Emperor wearing a proud expression on his face.

Then the king called Birbal and asked him too to enquire whose marriage was going on. When Birbal returned, Akbar asked the minister "Where are the couple going?" The minister said that the king had only asked him to enquire whose marriage was going on.

Then Akbar asked Birbal the same question. "O My Majesty! They are going to the city of Allahabad," replied Raja Birbal. Now the King turned towards the minister and said, "Now do you understand why Birbal is more important to me? It is not enough if you complete a task. You have to use your intelligence to do a little more work." The minister's face fell. He had learnt the importance of being Birbal, the hard way.

আমি কেবল গান গেয়ে বেড়াই

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী প্রমিতা মল্লিকের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত মল্লিকবাড়ীর দুর্গাপূজার দালানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি । সুন্দর লালমেঝের চাতাল, পিছনে চালচিত্র, কিছুটা মধুবনী ধাঁচে আঁকা, মাঝে চৌকো উঠোন, পুরোনো কলকাতার বনেদী বাড়ীর পরিবেশ সুস্পষ্ট । অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা পেলাম বহু আকাঙ্খিত এক গুণী শিল্পীর, যাঁর গান আমাকে মুগ্ধ করেছে, প্রভাবিত করেছে এবং যে গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমি নিজেকে বার বার । অত্যন্ত সহজ সরল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বিনয়ী, নম্র, স্মিতভাষী, একেবারে ঘরোয়া প্রমিতাদির এক অমূল্য ছবি পেলাম ঈশ্বরের আশীর্বাদে । সেই অভাবনীয় আলোচনার কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই এই আলেখ্যটিতে ।

শ্রীমতী প্রমিতা মল্লিকের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন মনে হয় নেই । সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বাংলাপ্রেমী, সংস্কৃতিপ্রেমী ও রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমী মানুষ যাঁকে শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছেন, তাঁর সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পেরে আমি ধন্য ও কৃতার্থ । প্রমিতাদির জন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে । পিতা শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায় ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব ও পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক । পূর্বপল্লীতে বাড়ী, তাই বাল্যকাল কেটেছে শান্তিনিকেতনের পরিবেশেই । কথা বলতে শুরু করার সাথে সাথেই প্রায় গানে হাতেখড়ি । মাত্র দু আড়াই বছর বয়সে কাকা শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ রায়ের কোলে বসে গান শেখা শুরু । কাকা ইটালিয়ান অর্গান বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন । কবিগুরুর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে আনন্দ পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু । মনে পড়ে উপাসনার সময় "তুমি আমাদের পিতা" গানটি শেখা । গানের হাতেখড়ি কাকার কাছেই । পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রী শান্তিদেব ঘোষ, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীলিমা রায় – এই রকম সব গুণীজনকে শিক্ষক, শিক্ষিকা রূপে পেয়েছেন । কলকাতায় এসে ইংরিজীতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন । সেই সময়ে শ্রী সুবিনয় রায়, শ্রী সুভাষ চৌধুরী, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, পুরাতনী বাংলা গানে শ্রী চণ্ডীদাস মাল, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পণ্ডিত কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণী মানুষের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করেছেন ।

স্বামী শ্রীযুক্ত তপন মল্লিক । বিয়ের পর মল্লিক বাড়ীর বনেদী একান্নবর্তী পরিবারে সমস্ত সংস্কৃতমনস্ক শিক্ষিত মানুষজনকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী । গানে কখনো অসুবিধা হয় নি । সংস্কৃতি চর্চায় আরও উৎসাহ পেয়েছেন । দুই কন্যা এখন নিজেদের সংসারে ব্যস্ত । তারই মধ্যে তাঁরা সংস্কৃতি চর্চা করে । প্রমিতাদি বেশীর ভাগ সময়েই বিদেশে, বিশেষ করে পূজার সময় বিলেত বা আমেরিকায় থাকেন । বাড়ীর পূজা, নাটক, গান, নাচ ইত্যাদির পরিচালনায় থাকেন স্বামী শ্রী তপন মল্লিক অথবা তাঁর দাদা শ্রী রঞ্জিত মল্লিক ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন প্রমিতাদির জীবন, মনন, আবেগ, সত্ত্বা ও প্রত্যেকটি মুহূর্তে । বলেছেন, "Rabindra sangeet is my way of life , এটিকে আলাদাভাবে ভাবতে পারি না" । সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ওনার জীবনের ধ্রুবতারা । কবিগুরুর ব্যাপ্তি, বিশালত্ব, দুর্বলতা, সংঘাত, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে গেছে এক বিরাটত্বে । রবীন্দ্রনাথ যিনি সমস্ত ব্যক্তিগত শোক, দুঃখ ও আনন্দের উর্দ্ধে উঠতে পারতেন, তাঁকে বুঝতে গেলে একটা refinement দরকার । তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা everlasting quality আছে এবং একটু শিক্ষিত না হলে তা বোঝা কঠিন । এই হোল প্রমিতাদির দৃষ্টিভঙ্গি । প্রমিতাদির মতে সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেঁচে থাকবে । রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের থেকে অনেক বেশী আধুনিক ও দূরদর্শী ছিলেন, তাই এই গান শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের স্থানে চলে গেছে । কথা একই থাকবে, কিন্তু হয়ত বা গাওয়ার স্টাইল যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহারে বদল আসবে । জাপান প্রসঙ্গে এসে প্রমিতাদির প্রথমেই মনে হোল শ্রীমতী তোমোকো খাম্বের কথা । তিনি সতীর্থ । জানালেন শান্তি জেঠুর কাছে ওনার নাম প্রায়ই শুনেছেন । জাপান বললেই মনে হয় চেরী ফুল, ফুজিয়ামা, কিমোনো

পরা মেয়েরা, অথবা মনে হয় বিনয়, নম্রতা ও চা উৎসব । জাপানী অক্ষর ছবির মত, ওনাকে আকৃষ্ট করে । ভোজনবিলাসী প্রমিতাদি একবার জাপানে বসে সুশি খাওয়ার ইচ্ছা আছে জানালেন ।

ঘুরে ফিরে যেসব রবীন্দ্রসঙ্গীত বার বার মনকে টানে, তা হোল 'ঐ আসনতলে মাটির 'পরে', 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', 'বিপুল তরঙ্গ রে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' ।

গানের স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন গত ২০ বছরেরও বেশী । নিজের স্কুল বৈতালিকে ২০০র ওপর ছাত্রছাত্রী আছে । এছাড়া বহু সংস্থার সাথে জড়িত । রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ভারতীয় সংস্কৃতির কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে । যে সমস্ত সংস্থার সাথে প্রতিনিয়ত কর্মরত সেগুলি হোল – Indian Council of Cultural

Research, Ministry of External Affairsএর empanelled artist, Ministry of Cultureএর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, State Music Academyর Advisory Board Member । রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত, রানীকুঠী অরবিন্দ আশ্রমের সাথে যুক্ত । বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর lecture demonstration করেন । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক আসে । ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন বলে আনন্দিত । শান্তিনিকেতনে পড়াশোনার সময় ও পরে বহুবার জাপানের কথা শুনেছেন ও বেশ কিছু জাপানী মানুষের সংস্পর্শেও এসেছেন। অথচ এখনও জাপানে যেতে পারেন নি, জাপান থেকে কখনও আমন্ত্রণ পান নি । তবে আশা রাখেন যে কোনও দিন নিশ্চয়ই জাপানে যাওয়া হবে ।

প্রমিতাদির সাথে ঘরে বসে কথা বলতে বলতে চোখে পড়ল বহু সংখ্যক পুরস্কার, সম্মানপত্র ও ছবি । ঘরের কোণায় রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট প্রতিচ্ছবি । এই ঘরটিতেই উনি গানের

ক্লাস নেন । বহু দেশ থেকে সংগ্রহ হয়েছে নানারকমের পাথর, কাঁচ, কাঠ, ঝিনুক অথবা কাগজের কচ্ছপ । এটি প্রমিতা দির শখের সংগ্রহ । দুটি আলমারি বোঝাই শুধু কচ্ছপ । পাশের দেয়ালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সাথে প্রমিতাদির ছবি বাল্যকালের । ঘরের আসবাবপত্র বা সাজসজ্জায় সর্বত্রই ছাপ রয়েছে এক প্রকৃত শিল্পীর । প্রায় এক ঘন্টা সময় গল্প করে কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না । বাড়ী ফেরার সময় আমি বিস্মিত, আপ্লুত ও অভিভূত এই অকল্পনীয় আশাতীত সাক্ষাতে । মনে পড়ে গেল সেই চির পরিচিত গলা ও সুর –

"মহারাজ একি সাজে, এলে হৃদয়পুরমাঝে
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে" ----

We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey.

- Stephen Covey

রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগে ৩৫ বছর

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

ব্রহ্মচর্য জীবন শেষে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার পর্ব চুকিয়ে যখন চাকরিতে ঢুকলাম, সেই ১৯৭৭ সালে কারও হাতে মোবাইল ফোন ছিল না । ইন্টারনেটও ছিল না । কোনও কোনও টেলিভিশানের পর্দায় সাদা ও কালো ছাড়া আর কোনও রঙ ছিল না তখনও ।

তবে আমার মধ্যে তখনও রয়ে গিয়েছিল তারুণ্যের কিছু আভাস । বাড়ি থেকে স্টেশন পর্যন্ত দৌড়ে গেলেও তেমন হাঁপাতে হত না । সারা রাত জেগে মাহজং খেলতে কোনও আপত্তি থাকত না । একটানা ১০ ঘন্টা অনায়াসে ঘুমাতে পারতাম এবং ভিন দেশের ভাষা শিখতে গিয়ে নতুন শব্দ মনে রাখতে বড় একটা কষ্ট করতে হত না ।

তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেল ৩৫ বছর । অক্টোবার ২০১২-তে হবে আমার জীবনের ৬০ বছর পূর্তি । জাপান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এনএইচকে-র নিয়ম অনুযায়ী সে মাসে হতে চলেছে আমার চাকরির অবসান অর্থাৎ ঘটে যাওয়ার কথা ছিল গৃহস্থ জীবন শেষে সন্ন্যাসী জীবনে প্রবেশের । কিন্তু সেটি কথার কথা । জাতীয় অবসর ভাতা প্রকল্পে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সরকার কোম্পানীগুলোকে সুপারিশ নামক ধমক দিতে শুরু করেছে যে তোমরা তোমাদের কর্মীদের ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখ । তাহলে পেনশনের জাতীয় তহবিলে ভাঙ্গন ধরবে না, বুড়ো কর্মীদের কম বেতন দিয়ে তোমাদের খরচাও যাবে কমে । সুতরাং আরও ৫ বছর বেড়ে গেল আমার চাকরির মেয়াদ ।

তবে অবসর তো অবসরই । আমার চাকরি জীবনের বর্ণনা দিয়ে ৩৫ বছর ধরে চলে আসা সুদীর্ঘ বাক্যে একবার যে দাঁড়ি বসিয়ে দেওয়া হবে, তাতে কোনও ভুল নেই । লোকে বলে, সময় চলে যায় তীরবেগে । তবে যত বেশী ক্ষণ উড়ে যায়, ততই তীর বেগ হারাতে বাধ্য । মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে যত বয়স বাড়ে, ততই গতি সঞ্চার করে সময়ের স্রোত । ৩৫ বছর চলে গেল দ্রুত, বিশেষ করে শেষের দিকে দিনগুলি কেটে যায় চোখের নিমেষে । অন্য দিকে অবশ্য সুখ-দুঃখ বিভিন্ন স্মৃতিতে ভরা এই বছরগুলি । আজ রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগে কেটে যাওয়া দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করব ।

হঠাৎ চাকরি জোটানো –

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি পড়েছিলাম । তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বছরে বাংলা শেখার সুযোগ হয় এবং তার পর থেকে হিন্দির চেয়ে বাংলার প্রতি বেশী ঝোঁক অনুভব করতে লাগলাম । স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম বাংলা ব্যবহার করা যায়, এমন চাকরিতে ঢোকার । কিন্তু সেই আশা মনে হয়েছিল একেবারে অবাস্তব, কারণ তখনকার জাপানী সমাজে বাংলার তেমন চাহিদা ছিল না (যদিও এখনও পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয় নি)। তবে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল । একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে গিয়েছিলাম কোনও একটা কাজে । হঠাৎ দেখি একটা নোটিস দেয়ালে সেঁটে দেওয়া আছে আর সেখানে লেখা আছে এনএইচকে বৈদেশিক বেতার সম্প্রচার রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগে কর্মী নিয়োগের কথা । এটাকে বাংলায় কি বলে ? মেঘ না চাইতেই জল ? সত্যি বলতে কি, তখন মেঘও চাওয়া হয় নি । যা হোক, এনএইচকে-তে টেলিফোন করে জানতে পারলাম , বাংলা বিভাগের এক প্রযোজককে পারিবারিক কারণে চাকরি ছাড়তে হওয়ায়, তার পদটি খালি হয়ে গেছে । নির্দ্বিধায় দরখাস্ত করলাম সেই পদের জন্য । লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার পর পেয়ে গেলাম বাংলা নিয়ে "স্বপ্নের" চাকরি ।

রেডিও জাপানের সহকর্মীরা ---

আমি যখন এনএইচকে-তে কাজ শুরু করি, তখন বাংলা বিভাগে দুজন জাপানী প্রযোজক ছাড়া কয়েকজন বাঙ্গালী কাজ করছিলেন অনুবাদক ও ঘোষক হিসাবে । তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ দাশগুপ্ত ও জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, যাঁদের আমি আগে থেকে চিনি । ১৯৭৫ সালের গ্রীষ্মকালে টোকিও বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত যে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আমার বাংলায় হাতেখড়ি হয়েছিল, তাতে তাঁরা দুজন শিক্ষক হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন । কর্মসূচিটি শেষ হওয়ার পরেও কল্যাণদা স্বেচ্ছায় আমাদের বাংলা চর্চায় সাহায্য করেছিলেন । চেনা মুখ থাকাতে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধা হয় নি ।

বাংলায় অ-আ-ক-খ পড়তে পারলেও বিস্তারিত কিছুই জানতাম না । তাই অনুবাদকরা যে ইংরেজী স্ক্রিপ্ট বাংলায় লিখতেন, সেগুলি নিয়ে নিজের মত করে চর্চা শুরু করলাম । অচেনা শব্দের মানে ও তার ব্যবহার খাতায় টুকে রাখতে শুরু করলাম । অন্য দিকে কাজের ফাঁকে খবরের অনুবাদের অনুশীলনও করতে থাকলাম । আমাকে রেমিংটন কোম্পানীর পুরনো বাংলা টাইপরাইটার দেওয়া হয় । তা দিয়ে অনুবাদের অনুশীলন করতে থাকলাম । অনুবাদের অনুশীলনে নিউজ বুলেটিন ব্যবহার করতাম । সংবাদে ব্যবহৃত শব্দ মোটামুটি নির্ধারিত বা অপেক্ষাকৃত সীমিত । তার জন্য অনুবাদের চর্চায় সুবিধা হয়েছিল ।

তবে ভাষার দক্ষতা বাড়ানোয় সব থেকে বেশী সহায়ক হয়েছিল বাঙ্গালী সহকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ । জাপানী ভাষার বিশেষজ্ঞ কল্যাণদা তো বটেই, অন্যান্য সহকর্মীরাও চমৎকার জাপানী ভাষা জানতেন , কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতেন । অনেক সময় তাঁদের কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হত, কিন্তু তাঁরা ধৈর্য হারান নি । এভাবে আস্তে আস্তে বাংলাটা শিখে ফেললাম ।

শান্তিনিকেতনে ---

১৯৮২ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাংলা শেখার সুযোগ পাই । রেডিও জাপানে কর্মরত জাপানী প্রযোজকদের বিদেশে গিয়ে ভাষা শিখে আসার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে । আমার দুজন সিনিয়র প্রযোজক কলকাতায় গিয়েছিলেন ভাষা শিখতে । আমি অবশ্য শান্তিনিকেতনে যেতে চেয়েছিলাম । তখনও রবীন্দ্রনাথের লেখা তেমন পড়তাম না । পড়তে পারার মত যোগ্যতাও ছিল না । কিন্তু লোকের মুখে শোনা শান্তিনিকেতনের পরিবেশ আমাকে আকৃষ্ট করে । বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কোনও রকমে ভিসা যোগাড় করে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে । শান্তিনিকেতনে গিয়ে

দেখি, সেখানে বিদেশীদের জন্য যে বাংলার ক্লাশ চালু আছে, তার রোল খাতায় আমার নাম নেই । আসলে সেই ক্লাসের মেয়াদ ১ বছর হলেও আমাকে রেডিও জাপান পাঠিয়েছে মাত্র ৬ মাসের জন্য । তাই তারা আমাকে বিদেশীদের ক্লাসে ভর্তি হবার অনুমতি দিতে পারেনি, যদিও ভিসা পাওয়ার সুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে শান্তিনিকেতনে আসার অনুমতি দিয়েছিল । বিপদে পড়ে গেলাম । নিরুপায় হয়ে বিশ্বভারতীর জাপানী ভাষার অধ্যাপক সাইজি মাকিনোর কাছে গিয়েছিলাম তাঁর পরামর্শ নিতে । আমার কথা শুনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারা বাংলার অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন । সোমেন দার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, তিনি আমাকে দেখেছিলেন যেদিন বিদেশীদের ক্লাশে ঢোকার অনুমতি না পেয়ে হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসে অফিস ভবনের সামনের সিঁড়িতে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম । তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে বাংলা শেখার কথা ঠিক হোল । সপ্তাহে ৩ দিন সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়িতে আমার জন্য ক্লাশ বসতো । ইতোমধ্যে ৫ বছর বাংলা চর্চার অভিজ্ঞতা ছিল আমার । তবুও আমার বাংলায় বেশ কিছু ত্রুটি ছিল । সেগুলো সংশোধন করে দিলেন সোমেন দা । প্রথম দিন আমার বাংলা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "কোথায় বাংলা শিখেছ তুমি" ? রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগে যে কয়েক জন ঘোষক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জনের জন্ম চট্টগ্রামে । তাঁর কথা শুনে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার উচ্চারণ খানিকটা তাঁর মতো হয়ে গিয়েছিল । সেই ভাষার টান সোমেন দার কানে লেগেছিল ।

তিনি আমার পাঠ্যবই হিসাবে বেছে নিলেন রবীন্দ্রনাথের "ছেলেবেলা" । কিন্তু তিনি সব সময় মূল রচনা আঁকড়ে ধরেন নি, বরং লেখার মধ্যে যদি কোনও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ভঙ্গি পাওয়া যেত, অথবা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আসত, তাহলে সেগুলোর মানে, অন্তর্নিহিত অনুভূতি ও প্রয়োগ-শৈলী নিয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতেন । এই ভাবে শেখানোর পদ্ধতিকে তিনি নিজেই বলতেন "এলোমেলো শেখানো" । প্রথম দিকে আমি ধরে নিয়েছিলাম এলোমেলোভাবে শেখানো মানে বিস্তারিত ও ব্যাপকভাবে শেখানো । পরে একদিন কলকাতায় আমার পরিচিত এক জন বাঙ্গালীকে বললাম যে মাষ্টারমশাই আমাকে এলোমেলোভাবে শেখাচ্ছেন । কথাটা শুনে তিনি কেন ভ্রু কুঁচকেছিলেন তখন বুঝতে পারি নি । কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম কথাটা সোমেন দা বিনয় করে বলেছিলেন, তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ি । সোমেন দার কাছে শিখতে পেরেছি বাংলা ভাষা কত সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় । শান্তিনিকেতনে ছিলাম মাত্র ৬ মাস, কিন্তু এই অল্প দিনের অভিজ্ঞতা বাংলাকে আরও আমার কাছে নিয়ে আসতে, ভাষাটাকে আরও আপন করে নিতে সহায়ক হয়েছিল ।

অধ্যাপক আজুমা ---

শান্তিনিকেতন থেকে জাপানে ফিরে আসি ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে । ফিরে এসে প্রথম প্রথম ভাল লাগত না । আমাদের বাঙ্গালী শ্রোতারা রেডিও জাপানের কাছে কী রকম অনুষ্ঠান, কী ধরণের পরিবেশনা আশা করছেন, ৬ মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে সে কথা ভাবলে মনে হত শ্রোতাদের সেই আশা মেটাতে আমরা অপারগ । সবার সামনে খোলাখুলি সেই অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে সিনিয়রদের বকুনি খেতে হয়েছিল । তবে তাঁরা যাই বলুন না কেন, রেডিও জাপানে চাকরি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এমন জিনিস অবশ্যই খুঁজে বের করা প্রয়োজন ছিল যা আমার মধ্যে কাজের স্পৃহা ও স্ফূর্তি জোগাবে এবং কাজ থেকে আনন্দ পেতে সাহায্য করবে ।

এমনই এক দিন অধ্যাপক কাজুও আজুমা এনএইচকে-তে এলেন কোনও কাজে । তখন জাপানের এই স্বনামধন্য রবীন্দ্র গবেষকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় । প্রথমে তিনি আমার কথায় তেমন আগ্রহ দেখান নি । কিন্তু আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম জেনে হঠাৎ তাঁর মনোভাব বদলে গেল । তিনি জাপানী সমাজে খুব মিশুকে ছিলেন না । কিন্তু যে কোনও বাঙ্গালীকে ভালবাসতেন এবং বাংলার সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকে আদর করতেন । আমি তাঁর পুরোনো বন্ধু সোমেন দার কাছে বাংলা শিখেছি জেনে আরও খুশী হয়েছেন । তার পর তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ শুরু হয় । অধ্যাপক আজুমা প্রায় প্রত্যেক বছর টোকিওতে রবীন্দ্র জয়ন্তী করতেন তাঁর নিজের উদ্যোগে এবং বিশ্বভারতী থেকে বিশিষ্ট শিল্পী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাতে আমন্ত্রিত হয়ে জাপানে আসতেন । এক সময় তিনি ভারত ও বাংলাদেশ থেকে নামকরা লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের আমন্ত্রণ করে জাপান-বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেন । তাতে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং হায়াত্ মাহমুদরা অংশ নিয়ে জাপানী সাহিত্যিক ও গবেষকদের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও জাপানী সাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন । আমি এই সব অনুষ্ঠানে গিয়ে আমাদের রেডিওর জন্য প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম । কখনও কখনও তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করেছি । এই সবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার প্রতি আজুমা সেনসেইয়ের গভীর ভালবাসা এবং সেই ভালবাসার বহির্প্রকাশ খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার । তিনি বাংলাকে যে এত আপন করে নিতে পেরেছেন, সেটা আমাকে অভিভূত করে এবং তাঁর একনিষ্ঠতা একটি আদর্শ হিসাবে আমার মনে স্থান পায় । সুযোগ পেয়ে অধ্যাপক আজুমাকে কেন্দ্র করে জাপানে রবীন্দ্র চর্চার বিষয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে তুলে ধরি এবং তাতে শ্রোতাদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যায় । তখন মনে হল, রেডিও জাপানে কাজ করার মানে খুঁজে পেলাম ।

রবীন্দ্রনাথের ৫০ তম মৃত্যু বার্ষিকী ---

১৯৯১ সাল ছিল কবিগুরুর ৫০ তম মৃত্যু বার্ষিকী । এই বিশেষ বছর উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও জাপানের সম্পর্ক নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ নিই । রবীন্দ্রনাথ মোট ৫ বার জাপান এসেছিলেন । সফরকালে তিনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেই সব জায়গা ঘুরে তাঁর পদচিহ্ন খুঁজলাম । অনুষ্ঠান-পরিকল্পনার জন্য যে আজুমা সেনসেই-এর সাহায্য ও পরামর্শ নিয়েছিলাম, সে কথা বলাইবাহুল্য । এই নিয়ে মাসে মোটামুটি একটা করে অনুষ্ঠান তৈরি করতাম । প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল অধ্যাপক আজুমার সঙ্গে সাক্ষাতকার, যেখানে তিনি কবিগুরুর সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত বলেছিলেন । তার পরের অনুষ্ঠানের জন্য আমি ইয়োকোহামার সানকেই-এন উদ্যানে গিয়েছিলাম । ১৯১৬ সালে

প্রথম জাপান সফরের সময় রবীন্দ্রনাথ মেইজি আমলের বড় রেশম ব্যবসায়ী সানকেই হারার নির্মাণ করা জাপানী ধাঁচের এই সুন্দর বাগানের একটি বাড়িতে কয়েক মাস অবস্থান করেন । তিনি যেখানে থাকতেন, সেই বাড়ি আর নেই । তবু সেই বাড়িটি যেখানে ছিল, সেই টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি ।

সেই ১ বছরের মধ্যে ঘুরেছি আরও নানা জায়গা, নানান লোকের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সাক্ষাতকার নিয়েছি । একবার আজুমা সেনসেই-এর সঙ্গে ইয়োকোহামাতে রেভারেণ্ড ৎসুশো বিয়োদোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । তখন তাঁর বয়স ৯০-এর কাছাকাছি । এই জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত ১৯৩০এর দশকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষা শিখতে । তিনি রবীন্দ্রনাথকে শুধু যে কাছ থেকেই দেখেছিলেন, তাই নয়, বিশ্বভারতীতে জাপান ভবন প্রতিষ্ঠা করার যে অনুরোধ কবি তাঁকে জানিয়েছিলেন, বিয়োদো জাপানে ফিরে আসার পরও তা কখনও ভোলেন নি । তবে যুদ্ধের ডামাডোল, যুদ্ধ পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ও নিজের জীবন সংগ্রামের জন্য গুরুদেবের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করা তাঁর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে । আমি যখন রেভারেণ্ড বিয়োদোর সঙ্গে দেখা করি, তত দিনে তিনি শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন গড়ে তোলার জন্য শুভাকাঙ্খীদের আহ্বান করে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ অভিযান হাতে নিয়েছেন । ১৯৯৪ সালে শান্তিনিকেতনের এক কোণায় নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় । অবশ্য বিয়োদো রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেন নি । নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের বছর তিনি পরলোকগমন করেন ।

রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য যে কটি জায়গা ঘুরেছি, সেগুলোর মধ্যে ইবারাকি জেলার ইযুরার কথা বিশেষভাবে মনে আছে । আধুনিক যুগে বাংলার সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিন্তাবিদ্ ও শিল্প সমালোচক তেন্‌শিন ওকাকুরার বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে । তেন্‌শিন তাঁর সৌন্দর্য্য বোধকে বাস্তব আকার দেওয়ার প্রচেষ্টায় শিষ্যস্থানীয় চিত্রকরদের নিয়ে ইযুরাতে নিহন বিজুৎসুইন বা জাপান চারুকলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জাপান সফরকালে ইযুরাতেও যান । তেন্‌শিন তার ৩ বছর আগে ১৯১৩-তে পরলোকগমন করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আর দেখতে না পেলেও, তেন্‌শিনের নির্মাণ করা ভবনগুলি পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল কবির । বাড়িগুলির একটির নাম রোক্কাকুদো । এই ছোট্ট এবং সুন্দর ৬ কোণার ভবনটি নির্মাণ করা হয় একেবারে সমুদ্র ঘেঁষে । জীবিতকালে এখানে বসে ধ্যান করতেন ও চা খেতেন তেন্‌শিন ওকাকুরা । রবীন্দ্রনাথও বাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধুর স্মৃতি রোমন্থন করেছিলেন ।

ইযুরাতে রবীন্দ্রনাথের আরও স্মৃতি রয়ে গেছে । তার একটি রবীন্দ্রনাথ যেখানে রাত্রি যাপন করেছিলেন, সেই বাড়ি । জাপান শিল্পকলা সংস্থার চত্তরের মধ্যে থাকা এই বাড়িটির মালিকানা পরে তেন্‌শিনের এক নৌকা-মাঝি (তেন্‌শিনের সখ ছিল সমুদ্রে মাছ ধরা)-কে দেওয়া হয় । আমি সেখানে গিয়ে দেখি, সেই মাঝির উত্তরাধিকারীর তত্ত্বাবধানে বাড়িটি রয়ে গেছে এবং তাদের গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । রবীন্দ্রনাথের কোনও প্রতিকৃতি দেখতে পাইনি ঐ বাড়িতে ।

আমি যখন গিয়েছিলাম, তার পর চলে গেছে ২০ বছরেরও বেশী সময় । গত বছর উত্তরপূর্ব জাপানে আঘাত হানা মহাভূমিকম্প জনিত ৎসুনামির ঢেউ ইযুরাতেও আক্রমণ করে এবং মুহূর্তের মধ্যে রোক্কাকুদো ভবনটি ভাসিয়ে নিয়ে যায় । স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় ভবনটি এ-বছর পুনর্নির্মাণ করা হয় । অন্য দিকে, রবীন্দ্রনাথ যে ঘরটিতে ছিলেন, সেটার কী হয়েছে, জানি না । অবসরে যাওয়ার আগে কিছু দিন ছুটি পাওনা আছে, ভাবছি তার সদ্ব্যবহার করে এক দিন ইযুরা থেকে ঘুরে আসব ।

বাঙ্গালীদের মাঝে ---

৩৫ বছরের চাকরি জীবনে অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে । নামী-অনামী বহু লোকের সাথে চেনাশোনা হয়েছে । অফিসের ডেস্কের ড্রয়ারে জমে ওঠা নেম-কার্ডের সংখ্যা হয়ত ১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে । গণমাধ্যমে কাজ করার অন্যতম সুবিধা হোল বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া । যাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ । সাহিত্যিকদের

মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, নবনীতা দেবসেন এবং

হুমায়ুন আহমেদ, যিনি কিছু দিন আগে পরলোকগমন করেছেন । সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে প্রয়াত ভূপেন হাজারিকা, ফরিদা পারভীন, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, পরলোকগত উৎপল দত্ত, মমতাশংকর ও আরও অনেকে । এই সব প্রখ্যাত লোকদের পাশাপাশি সাধারণ শ্রোতাদের সাথে পরিচিত হওয়ার আনন্দও কোনও মতেই কম নয় । কিছু দিন আগে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম । যেখানে গিয়েছি সব জায়গায় রেডিও জাপান বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে । আমি আসছি জেনে তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন । সেকথা জেনে খুব ভাল লাগল ।

আমার বাঙ্গালী বন্ধুদের কথা বলতে গেলে বাঙ্গালী সহকর্মীদের কথা ভুললে চলবে না । অফিসে সব সময় সহকর্মীদের সাথে দেখা করছি, তাঁদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি । এটা শুধু বাংলা ভাষা আয়ত্ত করায় সহায়ক হচ্ছে তাই নয়, বাঙ্গালীদের মনুষ্যত্ববোধ ও

বাঙ্গালী সংস্কৃতি জানার সুযোগও হচ্ছে । জাপানে অন্য কোথাও এরকম পরিবেশ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না । নিজে কোনও চেষ্টা না করলেও রোজ বাংলা ভাষার শব্দ-তরঙ্গের মাঝে ভেসে যেতে পারছি ... সেটাই আমার পক্ষে পরম আনন্দের ব্যাপার ।

যেদিন বাংলাকে আমার জীবনসঙ্গী করেছিলাম, তখন থেকে ৩৫ বছর অতিবাহিত হল । এনএইচকে-র কর্মী হিসাবে হয়ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছুই অর্জন করতে পারিনি । গৃহস্থ হিসাবে দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছি কিনা জানিনা । তবুও আমি এখন নিজেকে ধন্য মনে করছি ... বাংলাকে বেছে নিয়ে মন্দ করিনি, সেকথা ভেবে ।

"A street-hawker had on his head a basket full of empty bottles, as he walked along to the bazaar.

"He hoped to sell the lot at a profit of ten rupees and, in ten days, he calculated his earnings could accumulate to a hundred rupees. With that as capital, he planned to switch on to more profitable deals and imagined to make a pile of a lakh of rupees in a few months and then build a bungalow with a lovely garden tended by a regiment of servants, beaming all round the house. There, he saw himself on a sofa in the greenery playing with his grandchildren.

"As he was engrossed in that charming scene, suddenly he saw among his grandchildren, the children of one of the servants; he got angry at this unwanted intrusion. Believing his fantasy to be a reality, he suddenly grabbed the child and gave it a swift hefty push, only to find that the basket of bottles had fallen on the road and all hopes of even the ten rupees lost!"

- Heart to Heart, Volume 8 Issue 08, Aug 2010

আবিষ্কার

- তপন চক্রবর্তী

"আচ্ছা বলতো, আমরা যখন কোনও জিনিস চিবিয়ে খাই, তখন দাঁতের ওপরের পাটিটা নড়ে না নিচের পাটিটা" ? তারপর একটা আঙ্গুল তুলে বললো, "না, না, মুখে হাত দেওয়া চলবে না"। আমি বললাম, "কেন, ওপরেরটা" ? ও বললো, "হাঃ হাঃ, এই তো, নিজের মুখ কেমন করে নড়ে তাও ভেবে দেখিস নি ? নে, এবার হাত দিয়ে দ্যাখ" ।

এই আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সামু । ছেলেবেলা থেকেই বেশ মেধাবী । সব ব্যাপারেই খুব উৎসাহী, আর সব কিছু জানার খুব আগ্রহ । তবে ওর সবথেকে বিশেষত্ব ছিল নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করার প্রবল ইচ্ছা ।

সেই বয়স থেকেই কতরকমের পার্পিচুয়াল ইঞ্জিন, মানে যা কিনা কোনও ইন্ধন ছাড়াই নিরবধি চলতে পারে, এমন একটা কিছু বানানোর হাজার ব্যর্থ চেষ্টা করেও, এই বয়সেও সে হাল ছাড়ে নি । বাড়ি ভর্তি নানান আধ-শেষ করা মডেল, তারের টুকরো, ভাঙা পিসিবি আর সোলার প্যানেল । চিলেকোঠার ঘরটাই ওর প্রধান গবেষণাগার । ওখানে যে কতরকমের ভাঙা মেশিন সে জড়ো করেছে তার হিসেব নেই । তবে আজকাল ওর চিন্তা অনেকটা প্র্যাকটিকাল এবং বাণিজ্যিক । সবথেকে বেশী দুশ্চিন্তা ওর চিনেদের নিয়ে । ও কষ্ট করে আবিষ্কার করবে আর চিনেরা এক বছরের মধ্যে তার কপি করে নেবে ? এটা ও মোটেও মানতে পারে না । তাই আর সব টেকনিকাল জিনিসপত্রের মাঝে ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট করার সব বই আর বড় বড় পেটেন্ট ব্যারিস্টারদের নাম-ঠিকানাও সব তৈরি আছে ।

ছোটখাট নতুন কিছু আবিষ্কার সে যে একেবারে করেনি তা অবশ্য নয় । এই তো বছর কয়েক আগে একটা মশা তাড়ানোর রেডিও বানিয়েছিল । তা থেকে গান তো হবেই, এছাড়াও একটা বিশেষ আল্ট্রাসাউণ্ড শব্দ বেরোবে যা মানুষ শুনতে পাবে না, কিন্তু মশারা শুনতে পাবে । আর ওই শব্দে নাকি কোনও মশাই ঘরে ঢুকবে না । অভিনব আইডিয়া ! ওর প্ল্যান ছিল ওই রেডিওর পেটেন্ট নিয়ে রেডিও কোম্পানী আর রেডিও স্টেশনগুলোকে বিক্রি করবে । যারা ওই রেডিও কিনবে, তারা গান তো শুনবেই, তাছাড়া মশার কামড় থেকেও নিস্কৃতি পাবে । বললাম, "কি রে, এমন রেডিও বানালি, তার ডেমো দিবি না" ? বললো, "হ্যাঁ চলে আয়, সামনের রবিবার । মডেল লঞ্চ করবো আর সঙ্গে চা আর সিঙ্গাড়া" ।

ওর নানান আবিষ্কারের সাক্ষী আমি এই প্রথম নয় । তবুও ওই চা-সিঙ্গাড়ার লোভে চলে গেলাম রবিবার সন্ধ্যেবেলা । ওর বাড়ি গিয়ে দেখি আরও কিছু লোক জড়ো করেছে । চেনাশোনা ফটোগ্রাফার, টিভি-র লোক, সব হাজির । প্ল্যান অনুযায়ী আধ ঘন্টা ডেমো, তারপর হাততালি, তারপর চা । সবশেষে প্রেসের ইন্টারভিয়্যু ।

রেডিওটা একটা টেবিলে রাখা, খাসা গান চলছে । ঘরের সব জানালা বন্ধ । সন্ধ্যেবেলা এই সময় জানলা খুললেই মশারা নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে ঢোকে । ক্যামেরা রেডি, লাইট রেডি, সময় দেখে জানালা খুলে দেওয়া হোল । আর দু মিনিটের মধ্যেই দু দুটো মশা ঘরে ঢুকে ঠিক ওই রেডিওটার ওপরেই গিয়ে বসলো পরম সুখে । বোধহয় ভাবছিল কাকে আগে কামড়াবে । কিম্বা আমাদের কাছে শ্রবণাতীত হলেও ওই আওয়াজই হয়ত ওদের কানে সুমধুর গান হয়ে বাজছিল । যাই হোক, অবস্থা বুঝে জানালা আর ক্যামেরা, দুইই বন্ধ করে দেওয়া হোল । সামু বললো, "ওটা একটু টিউনিং করতে হবে । তবে আজ কিন্তু অন্য দিনের থেকে মশা কম ঢুকেছিল বল"। কে জানে, আমরা তো আর গুণে দেখি নি । চা-সিঙ্গাড়া দেখে কেউ আর কোনও দ্বিমত করলাম না । তবে ওই পেটেন্টও আর হয় নি ।

তবে এবার যে আইডিয়াটা মাথায় এসেছে, সেটা একেবারে সাঙ্ঘাতিক । এ তো কাজ করবেই ! একটা প্রটোটাইপ বানাতে এমন কিছু খরচা বা সময় লাগবে বলে মনে হয় না । এই তো দুটো মাইক্রো মোটর , কয়েকটা সেনসর আর কয়েকটা সলিনয়েড পার্কস্ট্রিটের হবি শপ্ থেকে, আর একটা কন্ট্রোল বোর্ড যা কি না সে অনেকবার বানিয়েছে, তাছাড়া তার আবিষ্কার করা আসল জিনিসটা, যেটার কোনও টেকনিকাল নাম এখনও দেওয়া হয় নি । এই জিনিসটাই হবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, মানব-জাতির সবথেকে বড় বড় আবিষ্কারের মধ্যে একটা । ওই আবিষ্কারের একটা ব্র্যাণ্ড নামও ও ঠিক করে নিয়েছে, "সামু-এল", নিজের নামও রইল আর একটু সাহেবী স্টাইলও । একটু সাহেবী নাম না হলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে চলবে কেমন করে ? মনে মনে একটা ডিজাইনও বানিয়ে নিয়েছে সামু, সব যন্ত্রগুলোর ওপর লেখা থাকবে "সামু-এল ইনসাইড" ।

নামকরা পেটেন্ট ব্যারিস্টার, যাদের নাম তার অনেক দিন থেকেই জোগাড় করা আছে, তাদের ক'বার ফোনও করা হয়ে গেছে । এরা সবাই খুব পজিটিভ, বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে । ড্রয়িং, স্পেসিফিকেশন সব রেডি । সামু ভাবছে এই আবিষ্কার যখন পৃথিবীর কোনায় কোনায় ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে, "সামু-এল"- ভাবাই যায় না ! এমন সহজ ব্যাপার, কিন্তু কেউ ভাবতেও পারে নি, এক্কেবারে অরিজিনাল । হয়তো নোবেল প্রাইজের নমিনেশন বা নিদেনপক্ষে কোনও পদ্মভূষণ টুষণ তো হয়ে যেতেই পারে । উত্তেজনায় থর্থর্ করে কাঁপছে সামু ।

তবে চিনে ? চিনেরা তো কপি করবেই ! তাই তার আগেই মার্কেট ক্যাপচার করে ফেলতে হবে ।

চিনেদের কথাতেই মনে পড়লো তিয়েনাম্মেন স্কোয়ারের কথা । পুলিশের গুলি চলছে, ধুম্ করে একটা আওয়াজ ! আর ওই আওয়াজে অমন মূল্যবান ঘুমটা গেল ভেঙ্গে !

এটা কি তবে স্বপ্ন ছিল ? কিন্তু আইডিয়াটা ? সেটা তো নির্ভুল । সামু তড়াক্ করে নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে বসলো আইডিয়াটা লিখে ফেলতে, পরে যদি ভুলে যায় । কি যেন ছিল সেই আবিষ্কারটা ? সামু অনেক চেষ্টা করলো মনে করার । ডোবার জল থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি, না সেই টারবো চার্জ জুতো যা পরে মাইলের পর মাইল দৌড়ে যাওয়া যায়, না পকেট এয়ারকণ্ডিশনার ? না, না, এগুলো তো সব পুরনো আইডিয়া । এটা ছিল এক্কেবারে আলাদা, এক্কেবারে অরিজিনাল ।

আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাকি স্বপ্নের রেশটা দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে গেল , কিছুতেই মনে পড়লো না ।

একা-বোকা

- গৌতম সরকার

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো গৌতম ।

মোরেসিও এখন ঘরে নেই । তাহলে কার কাছে মুখ লুকালো ও ? নিজের কাছেই ? কান দুটো কি জমে গেল ? নাকটাও কেমন যেন ... । তারপর ধপাস্ করে বসে পড়লো ও, ওর ডর্ম রুম-এর বাঙ্ক বেডের নিচের তলাটায় । নাঃ পশ্চাদ্দেশটা অনুভব করা গেল ।

সেদিনকার কথা মনে পড়ে গেল ওর, যেদিন সটান চলে গিয়েছিল বিজন সেতুর পাশে ভারত সেবাশ্রম সংঘে, শুধুমাত্র বালিগঞ্জের বাড়িটা ছাড়ার ইচ্ছায় । তারপর কয়েকটা মাস কেমন যেন ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল । আজ আইওয়ায় বসে হঠাৎ এসব মনে পড়লো কেন ওর ?

'Morning buddy'. জ্যাসনের গলার আওয়াজ পেয়ে মুখ ফেরালো গৌতম । দেখলো ও এদিকেই আসছে প্রাতঃরাশের ট্রে-টা হাতে নিয়ে ।

'ও Hi Jason. একটু সরে বসলো গৌতম ক্যাম্পাস ক্যাফেটেরিয়ার টেবিলটায় ।

'Hummm, I see, you started eating some of our foods now'. গৌতমের পাশের চেয়ারটা টেনে নিতে নিতে বললো জ্যাসন । 'Have you got any test or quiz today' ?

'yup, P.Chem in the morning and Calc-II after lunch. I am not ready for either one'

'Why man ? Usually you are so prepared'! স্ক্র্যামবেল্ড এগ্-এ ফর্ক চালাতে চালাতে বললো জ্যাসন ।

'Not today', একটু আনমনা শোনালো গৌতমকে ।

'Hummm, home sick' ?

'No. Actually ... , actually I would not know anything about being home sick. I sort of wanted to run away from my home. And here I am, exactly on the opposite side of the globe' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো গৌতম ।

'Well, that makes two of us then' বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল জ্যাসন, হ্যাণ্ডশেকের জন্য । 'My parents divorced when I was two and I grew up watching them fight all my life, over me and by using me. I just wanted to get away from BOTH of them, as far as I could. That is why I chose Iowa for college, although they wanted me to stay close to them in California'.

'My parents are not divorced. They would not know anything about 'divorce'. My mom died when I was in 6th grade. I just wanted to run away ever since'.

'I am sorry to hear that. By the way, are you ready for tonight? It's Halloween Friday today, you know. You must put on a costume. And who knows, you may get 'lucky' tonight, INSTEAD of getting candy', বলে দুবার ভুরু নাচিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো জ্যাসন । 'I know that you like Diana', বাঁ চোখটা মেরে বললো ও, 'Have you asked her out yet'? Tonight is your chance! Okay, I better go. I will catch you later, at lunch perhaps'.

'See you Jason', গৌতম cerealটা শেষ করতে করতে বললো ।

হ্যালোইন ? ET সিনেমা-য় এর কি একটা দৃশ্য ছিল না ? ঐ যে, বাচ্চারা সব অদ্ভুত রকমের, আর নানান রকমের পোশাক-আশাক পরে বাড়ি বাড়ি যায় চকোলেট-লঞ্জেস পাবার জন্য । নিউ এম্পায়ারে দেখতে গিয়েছিল না ও সিনেমাটা ? তারপর রেস্টুরান্টে খেতে গিয়ে ...

'বড় ডিরেক্টর না ঘোড়ায় ডিম'! বেশ রেগেই বলে উঠলো তপোদেব ।

'আঃ, তপা; একটু আস্তে বল'। আমিনিয়ার মেনুতে মোগলাই পরোটার দামটায় চোখ বোলাতে বোলাতে বললো সুকোমল ।

'না রে সুকু, ও ঠিকই বলেছে'। সুমন্তও বেশ উত্তেজিত । 'সত্যি কথাটা বলার সৎসাহস না থাকলে কোনও কিছুতেই 'বড়' হওয়া যায় না, বুঝলি' ? বেশ কনফিডেন্সের সাথে কথাগুলো বলে দিল সুমন্ত ।

'শালা বড় ডিরেক্টর হবে তো হও না, কিন্তু গল্পটার বেলায় ধাপ্পাবাজি কেন বাবা'। তপা তখনও উত্তেজিত ।

দু হাতের তালুর মাঝে লবণ আর গোলমরিচের শেকার দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে, ঘাড় গুঁজে একটু আনমনা ভাবে এসব শুনে যাচ্ছিল গৌতম । ভাবছিল মোগলাই পরোটার দাম দেবে কোত্থেকে ও । ওর তো পকেটে অত পয়সাই নেই । ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললো ও কথাটা ।

'চিন্তা করিস্ না, আমার কাছে কিছু এক্সট্রা আছে । যা খাবি অর্ডার দে'। আশ্বাস দিল সুমন্ত ।

'স্পিলবার্গ যে সত্যজিত্ রায়ের 'বঙ্কু বাবুর বন্ধু' গল্পটা ঝেড়েছে, এটা পরিস্কার । একবার মেনশন করলেই তো পারতো । ব্যাস, মিটে যেত' । একটু স্বগতোক্তির সুরে বললো গৌতম । 'তাতে ET ছবিটার মাহাত্ম্য কিছু কমতো বলে তো আমার মনে হয় না' । ক্লাস সেভেনের ছোকরা গৌতম একেবারে পাকা ফিল্ম-ক্রিটিকের মতো কোরে মত দিল ।

'শালা আমাদের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট-এর নামটাও তো একটু বাড়তো ! না কি ? ব্যাটা ওই 'Temple of Doom' করতে এসেই মালটা হাতিয়েছে, বুঝলি' । খুব নিশ্চিত হয়েই যেন কথাগুলো বললো তপা । মোগলাই পরোটা এসে যাওয়ায় আর কথা বাড়াতে পারলো না ও ।

'We will be closing our breakfast soon, sir'; পাশের টেবিলটা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে বললো ক্যাম্পাস ক্যাফেটেরিয়ার কাজের মেয়েটা । শুনে একটু নড়েচড়ে বসলো গৌতম । P.Chem-এর নোটস্গুলোতে আর চোখ বোলানো হোল না ওর ।

নাঃ, পরীক্ষা দুটোর কোনোটাই ভাল হোল না আজ গৌতমের । প্রবলেমস্গুলো ঠিকঠাক হয়েছে হয়তো, thermodynamics-এর ডেফিনিশান কিছুতেই মনে করতে পারলো না ও । পুজোটাও এবার মিস্ হয়ে গেল তবুও এই শেষ অক্টোবরের পড়ন্ত বিকেলে

মনটা আজ কেমন যেন ফুর্‌ফুরে লাগলো ওর । আজ স্নোইং হবার কথা সেই জন্যেই কি ? জীবনে প্রথম স্নো দেখার সুযোগ হবে । চারদিকটা কেমন সাদা হয়ে যাবে, তাই না ? কেমন যেন একটা উত্তেজনা হোল ওর । আচ্ছা, স্নোইংয়ের সময় তার মাঝখানে চৈতন্যের মতো দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন হবে ? ঐ কলকাতায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বৃষ্টিতে ভিজতে যেরকম ভাল লাগতো সেরকম ? স্নো-টা যখন পড়বে, সেটা কি পাউডারের মতো হবে ? হঠাৎ ডায়ানার কথা মনে পড়ে গেল গৌতমের । ওর গায়ের চামড়াটা কি মসৃণ, তাই না ? সেদিন হ্যাণ্ডশেক করার সময় কেমন যেন তুলোর মতো নরম মনে হয়েছিল ওর হাতটাকে । আচ্ছা, ওর চোখ দুটো কি নীল ? না সবুজ ? নীল-সবুজের মাঝামাঝি কিছু একটা হবে বোধহয় । কিরকম একটা অনাবিল আনন্দে মনটা ভরে গেল গৌতমের । নাঃ, আজ সাহস কোরে কথাটা বলতেই হবে ডায়ানাকে । নিঃশ্বাসটা কেমন যেন ভারী হয়ে আসছে, হন্‌হন্ কোরে ডর্মের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করলো গৌতম ।

কি যেন একটা পার্টি চলছে ডর্মের কমন রুমটায় । চার দিকে সব রঙবেরঙের বেলুন আর নানান সাইজের পামকিন দিয়ে নানা রকম সাজসজ্জা । এই পামকিন নাকি আবার খাওয়াও যায় । আচ্ছা, এটা কি ফ্রুট্, না ভেজিটেবল্ ? এটা কি আমাদের দেশের কুমড়োর মতো, নাকি তালের মতো ? কোনোটাই না বোধহয় । তা হলে এটা কি আমাদের দেশের লাউ-এর মতো ? না হলে পামকিনকে নিয়ে এতো হৈ হৈ করার কি আছে ? পামকিন দিয়ে কি তাহলে ডুগডুগি বানানো যেতে পারে ? ধুর্, এ দেশে আবার বাউল আছে নাকি, যে ডুগডুগি হবে ? সেদিন আবার টিভি-তে দেখলাম এক বাবা তার পুচকি মেয়েটাকে ডাকছে পামকিন বলে ! ঠিক ব্যাপারটা কি ? পামকিনকে নিয়ে এতো মাতামাতি কেন ? এখানে নাকি একটু পরে এয়ারে ক্যাণ্ডি থ্রো করা হবে ! সেটা কিরকম হবে ? আমাদের দেশের হরির লুটে বাতাসা ছোঁড়ার মতো ? ভাবতে ভাবতে ভিড়ের মধ্যে নিজের অজান্তেই ডায়ানাকে যেন খুঁজতে লাগলো গৌতম । খুব জোরে মিউজিক চলছে এখানে, সবাই তার সাথে কিরকম তালে তালে নাচছে । মিউজিকটা কেমন যেন কর্কশ ধরণের, তাই না ? ও মনে মনে সুর ভাঁজতে লাগলো ... 'লাউ-এর আগা খাইলাম, ডগাগো খাইলাম, লাউ দি বানাইলাম ডুগডুগি, সাধের ..." । নাঃ, ঠিক জমছে না । খুব একা একা লাগলো গৌতমের । একটু ডায়ানার দেখা যদি পাওয়া যেত ..., ওর ঐ পাগল কোরে দেওয়া নীল চোখদুটোর হাতছানি যেন উন্মত্ত কোরে তুললো গৌতমকে । তবু, এই ভিড়ের মধ্যেও, একাকীত্বের ভাবটা যেন হতোদ্যম কোরে দিতে লাগলো ওকে । বাইরে এতো ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও জামার ভেতর ঘাম অনুভব করলো গৌতম ।

বেশ কিছুক্ষণ এর ওর সাথে নাচানাচি করার চেষ্টা করলো গৌতম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। কি রকম যেন খাপছাড়া মনে হতে লাগলো ওর ।

পিঠে দুটো আলতো টোকা ফিল্ করলো গৌতম । পিছন ফিরে তাকাতেই নীল চোখ দুটো চিনতে পারলো ও । কিন্তু একি ! ডায়ানা এরকম সেজেছে কেন ? জামা-কাপড় সব কালো, টুপিটাও । হাতে আবার ওটা কি ? লাঠি ? মুখে কি কালো রঙ মেখেছে ও ?

'How do I look 'গুটাম' ? দু হাত ছড়িয়ে, পা দুটোকে ক্রস কোরে জিজ্ঞেস করলো ডায়ানা । 'I am a witch tonight.' হঠাৎ এক পায়ে একটা চর্‌কি-পাক খেয়ে বললো ও ।

ও কি মিটি মিটি হাসছে ? মুখে কালো রঙ মাখায় ভাল কোরে বোঝা যাচ্ছে না । ও কি আমায় কাছে ডাকছে ? ভাবতে ভাবতে ডায়ানার একদম কাছে চলে এলো গৌতম ।

'Do you have anything like this in India'?

'Not really' লাল চোখ, কালো কালী ঠাকুরের মুখ, আর দোলের দিনের রঙমাখা মুখের কথা মনে পড়লো গৌতমের, কিন্তু ঠিক বোঝাতে পারবে না বোলে কিছু বললো না ও ।

ভিড়টা বোধহয় একটু পাত্‌লা হয়ে আসছে । রাত কত হোল ? একটা-দেড়টা হবে বোধহয় । ভোর চারটেয় আবার কাজ আছে । স্নো শভেল করতে হবে অন-ক্যাম্পাস জবের জন্য । হোমওয়ার্ক না হয় পরে করা যাবে এখন ...

'গুটাম্, would you like to come to my room upstairs'?

'May be some other time', সঙ্কোচের সাথে বললো গৌতম ।

'Come on. It's Friday night. Let's enjoy'

'No, I mean... actually... I have to work in a couple of hours. I have to shovel snow at 4' কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো গৌতমের ।

'Come on গুটাম, I really mean it'. বলে ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ডায়ানা । 'Let's have a couple of beer before you need to go to work . Besides, I have a surprise for you, I think'

দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ডায়ানার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরলো গৌতম । আহ্, কি নরম !

'Shhhh, carfew hours is in effect'! ঠোঁটে বাঁ হাতের তর্জনীটা ঠেকিয়ে বললো ডায়ানা । তার পর খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ডর্মের দোতলার উইমেনস্ ফ্লোরে উঠে এলো ওরা । হলওয়েতে ঢোকার ডাবল ডোরটা ঠেলতে ঠেলতে কপালের ঘামটা চট্ কোরে রুমালে ব্লট কোরে নিলো গৌতম । এতো গরম লাগছে হঠাৎ ...

কিসের আওয়াজ আসছে ডায়ানার ঘর থেকে ? টিভি-র ? হলওয়েতে ডায়ানার রুমের দিকে এগোতে এগোতে মনে হোল গৌতমের । কি আশ্চর্য ! চাবি দিয়ে না খুলে ও টোকা মারছে কেন দরজায় ?

'Baby please open the door, it's me', হুইসপার কোরে দরজার কাছে মুখ রেখে বললো ডায়ানা । কালো জামার সাথে কালো টাই পরা একটা ছেলে দরজা খুলতেই ডায়ানা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকের ওপর ।

'Baby, remember, I told you? Please meet my Indian friend গুটাম । He is such a sweet heart. He said that he would make me chicken curry some time. I absolutely adore him. Can you imagine they gave him a job to shovel snow? Poor thing just came from tropical part of India'!

'Oh! I am so sorry, গু—গুটাম'? দরজার মুখে দাঁড়িয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে বললো ছেলেটা হ্যান্ডশেকের জন্য ।

'গুটাম, Please meet my boyfriend Ken', খিল খিল কোরে হেসে বললো ডায়ানা । 'He came all the way from Nebraska, to spend the Halloween weekend with me. Isn't that sweet'?

লজ্জায়, রাগে, দুঃখে চরম অপ্রস্তুত আর অপমানিত ফিল্ করলো গৌতম । এতো বোকা লাগলো নিজেকে । কোনোরকমে কেন-এর সাথে একটা হ্যান্ডশেক কোরে বেরিয়ে এলো ডায়ানার ঘর থেকে । তারপর সোজা চলে গেল স্নো শভেল করতে । এই ঠাণ্ডায় স্নো শভেল করার জন্য ওর জামা-কাপড় আর জুতোজোড়া যে একেবারেই যথেষ্ট নয়, সে কথা মনেই এলো না গৌতমের । টের পেল যখন খানিকক্ষণ স্নো শভেল করার পর বুঝলো যে কান দুটোকে আর ফিল্ করতে পারছে না ও । নাকের ডগাটাও না । আঙ্গুলের ডগাওগুলোও কেমন যেন আড়ষ্ট ...

'গাউটুম, you better go home', একটু ইতস্ততঃ কোরে বললো মাইলস্, মেইন্টেনান্স টীমের সুপারভাইজার লোকটা । 'I don't feel safe for you to work here right now. You are freezing. Do you have snow-coat and snow-boot? You will need them to work here. Let me know if you need any help. I may have some extra pairs that may fit you'.

কোনোরকমে টলতে টলতে ক্যাম্পাসের রাস্তাটা ধরে সোজা ডর্মে ফেরত্ এলো গৌতম । দোতলার উইমেনস্ ফ্লোরটা ক্রস কোরে তিন তলার মেনস্ ফ্লোরে যাবার পথে কেমন যেন বিরক্ত লাগলো ওর । প্রথম স্নোইংটা কেমন যেন মিস্ হয়ে গেল ... রাগ হোল নিজের ওপরেই । তার পর কোনোরকমে ঘরে ঢুকে দু হাতে মুখ চেপে ও বসে পড়লো ওর বাঙ্ক বেডের বিছানায় । নিজের নাক-কান ফিল্ করার চেষ্টা করলো খানিকক্ষণ, তার পর আর কিছু ভাবতে পারলো না ও ...

দরজায় হঠাৎ চাবির শব্দে উঠে বসার চেষ্টা করলো গৌতম, কিন্তু আবার শুয়ে পড়লো ।

'Hey man', উঁচু স্বরে ওর পোর্তুগীজ উচ্চারণে বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো মোরেসিও । 'Are you okay? You have been sleeping all day !

I was in earlier, and you were snoring like a pig'!

'Really'? নাকটা আছে তাহলে ! কান দুটোকেও একবার টাচ্ কোরে দেখে নিল গৌতম । 'I am so sorry. Hope I did not bother you. What time is it'?

'It's about 8 in the EVENING that is' ঘাড়টা কয়েকবার ওপর নিচে নাচিয়ে, একটু মজা কোরে বললো মোরেসিও । 'you missed both brunch and supper'

'it's okay. I am not hungry' কম্বলটা সামলাতে সামলাতে বললো গৌতম ।

'I got to go now. Help yourself with some snack on my desk that my mom sent from Brazil. After all, what are room-mates for, ha'? মজা কোরে হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ কোরে বেরিয়ে গেলো মোরেসিও । ব্রাজিল কথাটা শুনে গৌতম মনে করার চেষ্টা করলো কলকাতায় এখন ঠিক কটা বাজে । রবিবার সকাল ৮টা মতো হবে না ? সময়টা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে । একটু পয়সা থাকলে একটা ফোন করা যেত । কি ভালই যে হোত তা হলে ! বড্ড একা লাগছে ওর এখন । বোকাও ।

There is no way to happiness, happiness is the way.

The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, not to worry about the future, or not to anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly.

- Buddha

জাপানে ছুটির বিড়ম্বনায় ক্ষুদ্‌দা

- অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্‌দা দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলেছিলেন যে এতদিনেও রমলা বৌদিকে কিছুতেই তিনি up to date করাতে পারলেন না । কলকাতার ছুটির দিন আর জাপানের ছুটির দিন যে এক হতে পারে না, এই সহজ সরল সত্য কথাটি কিছুতেই বৌদিকে বোঝানো যাচ্ছে না ।

নেতাজী সুভাষ বোসের জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী জাপানে নাকি ছুটি থাকে না । রমলা বৌদি শুনেছেন গত বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী জাপানে গিয়েছিলেন এবং ওখানকার নেতা তোজোর সঙ্গে দেখা করে ওখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন । রেংকোজি মন্দিরে নেতাজীর চিতাভস্মও নাকি রক্ষিত আছে । তা সত্ত্বেও ২৩শে জানুয়ারী জাপানে ছুটি দেয় না । ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসেও জাপানে ছুটি নেই । অদ্ভুত কথা ! জাপানে তো রাজা প্রজা দুইই আছে, তাহলে কেন ছুটি দেবে না ? প্রজাদের কোন দাম নেই ?

রমলা বৌদির উদ্বেগ জাপানীরা সরস্বতী পুজো এবং দোল উৎসব পালন করে না । বৌদি ক্ষুদ্‌দার কাছে confess করেছেন যে ছোটবেলায় সরস্বতী পুজোর আগে লোভ সামলাতে না পেরে দু রকম কুলই খেয়ে ফেলেছিলেন বলে তাঁর brainএর সিংহভাগটাই মা সরস্বতী ফাঁকা রেখে দিয়েছেন । অথচ জাপানীরা অত্যন্ত মেধাবী, যদিও তারা সরস্বতী পুজোও করে না, এবং পুজোর আগে কুল খেয়ে ফেলায় কোন পাপও হয় না । জাপানে বাঙ্গালীদের প্রধান পূজারী সুদেবদাও বলতে পারেন নি জাপানে কুল পাওয়া যায় কি না । ঠিক আছে, সরস্বতী পুজো না হয় নাই বা হল, কিন্তু দোল উৎসব ? ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে বুঝিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অপরিসীম, বহুমুখী তাঁর প্রতিভা, সুদূর প্রসারিত তাঁর লীলাক্ষেত্র; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জাপানে swimming poolএর ধারে গাছে বা উঁচু পাঁচিলে উঠে স্নানরতা জাপানী মহিলাদের পোশাক চুরি করে, পা ঝুলিয়ে বসে বাঁশি বাজিয়ে উক্ত রমনীদের সম্মোহন করেছেন, এমন কথা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বা Research Scholarরাও বলতে পারবেন না । কি জানি, দেবতা হলেও ভিসার সমস্যা হয়তো তখনও ছিল । যদিও ক্ষুদ্‌দা ভাবেন দোল উৎসবে জাপানে ছুটি ঘোষিত হোক এবং তাঁর যৌবনকালে পাড়ার কিশোরী তরুণীদের গালে কপালে মুঠো মুঠো আবির মাখানোর sensational স্মৃতির আবার action replay হোক ।

কোলকাতায় সোনার দোকানে রমলা বৌদির সারা বছরে যতই ধার থাকুক না কেন, ১লা বৈশাখের আগে তাঁকে সব ধার শোধ করে দিতে হয়, যাতে ঐ দিন থেকে নতুন বছর শুরু এবং সেই সঙ্গে নতুন ধার । জাপানে ২৩শে ডিসেম্বর সম্রাটের জন্মদিন, তার পর কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন বছর শুরু । তাহলে কি জাপানে তার আগেই সব সোনার দোকানে সব ধার শোধ করে দিতে হয় ? দাদা অনেক বুঝিয়েছেন জাপানে কোলকাতার মত অলিতে গলিতে সোনার দোকান নেই । সেখানকার মহিলারা দুপুরে সোনার দোকানে না গিয়ে কি করে ?

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে May Day অর্থাৎ শ্রমিক দিবস নিয়ে । জাপানে শ্রমিক দিবস নেই । কেন রে বাবা, ওখানে কি শ্রমিক নেই ? দোকানের কর্মচারী, bus driver, plumber, সাফাই কর্মী – সবাই কি মালিক ? অবশ্য শ্রমিক দিবস কথাটির উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি বৌদিকে বোঝান ক্ষুদ্‌দা কেন , ক্ষুদ্‌দার প্রপিতামহেরও কম্ম নয় । এর চেয়ে বরং তাঁদের স্বর্গে বসে অন্যান্য প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া অনেক ভাল ।

জাপানীদের রথযাত্রা উৎসব নেই । এই দিনে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো তৈরি করা এবং পুজো করা হয় । ক্ষুদ্‌দা অনেক বুঝিয়েছেন কোলকাতার মত জাপানে যত্র তত্র বারোয়ারি দুর্গা পুজো হয় না । রমলা বৌদি ভাবতেই পারেন না জাপানের ছেলেমেয়েরা ক্লাবঘরে বসে কী নিয়ে আলোচনা করে । চলতি নিয়ম অনুযায়ী দশমীর পরের দিন থেকে পরের বছরের পুজোর theme, plan, decoration নিয়ে আলোচনা করা হয় । বৌদির প্রতি ক্ষুদ্‌দার নিরীহ উপদেশ ওখানকার পুজোর নির্ঘন্ট ও অর্থনীতি থেকে দূরে থাকার । Empty brain-এ ওগুলো ঠিক ঢুকবে না, হজম করার প্রশ্নই নেই । সে যাক্‌গে, কথা হচ্ছিল রথ উৎসব নিয়ে । রথযাত্রায় রথের চাকার নিচে মহিলারা চুল কেটে দিয়ে দেন । জাপানীদের রথ উৎসব নেই, ছুটি তো নেই-ই । সেই জন্যেই হয়তো ওখানকার মেয়েদের চুলগুলো ঝাঁটার কাঠির মত সরু । দেখলে বৌদির গা পিত্তি জ্বলে যায় । ছেলেদের চুলের স্টাইল অবশ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা । মাথার চুল multi coloured and perpendicular to the skull. David Beckham , Virat Kohli – কে কাকে follow করছে জানা নেই । তবে ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে বলেছেন, জীবনে তো বহুবার রথের চাকার নিচে নিজের চুল কেটে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে চুলের শ্রীবৃদ্ধি কিছু হয়েছে কি ? দাদা ভাবেন, ভাগ্যিস বাঙ্গালী বধূদের ঘোমটা দেওয়ার চল আছে, তা না হলে হয়তো বৌদিকে দেখে মনে হত মায়াপুরের স্বল্পকেশী কীর্তনিয়া – কপাল ও মস্তকের কেশরাশির সীমানা অন্তর্হিত।

ক্ষুদ্‌দার বক্তব্য জাপান সরকার বৌদির পছন্দ মত ছুটির দিন ঠিক করবে না । ওদেশে ছুটির দিন নির্ধারিত হয় সপ্তাহের শুরুতে অথবা শেষে যাতে টানা তিন দিন সকলে ছুটি উপভোগ করতে পারে । ক্ষুদ্‌দা জানেন পশ্চিম বাংলায় যদিও ঐভাবে ছুটি নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, তবে বাড়তি ছুটিগুলো ইদানিং Monday অথবা Fridayতে ফেলার চেষ্টা করা হয়, মানে বাংলা বন্ধের কথা ক্ষুদ্‌দা বলতে চাইছেন । কোন এক রাজনৈতিক দল এই theory-তে বাংলা বন্ধ ডাকার জন্য সম্পূর্ণ সফল হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং দীঘা, বক্‌খালির resortগুলোতে ভিড়ে পা ফেলা যায় না ।

জাপানে ছুটির কার্যকারণ খুব অদ্ভুত রকমের । মার্চ মাস বা সেপ্টেম্বর মাসে এমন দিন আছে যেখানে দিন রাত্রি সমান – অতএব ছুটি । এই রকম অনেক আছে, তার মধ্যে আছে 'আজ থেকে ২০ বছরের ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হল এবং তারা মদ্যপান করতে পারবে' অতএব ছুটি । এর পরে কি তাহলে adult ছেলেমেয়েদের free mixing ও ভবিষ্যত জীবনে প্রবেশের অনুমতি প্রদান ও ছুটি ঘোষণা ? বৌদি প্রচণ্ড রেগে গেলেন, যদিও দাদা সরকারের প্রতি সাবধান বাণী একটু সুর করে গাইলেন,

'আর এগিয়ো না
বিপদে পোড়ো না'।

ওখানে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নেই, নেই কোন মিছিল, পথ অবরোধ । এগুলো না থাকার জন্য ওখানকার লোকেরা যে কি করে বেঁচে আছে দাদা বৌদি ভাবতেই পারেন না । তবে কয়েক বছর আগে কোন এক জায়গায় ছেলেবৌমার সঙ্গে দাদা বৌদি বেড়াতে গিয়েছিলেন । সন্ধ্যেবেলায় এক বিশাল candle মিছিল আসতে দেখা গেল । দাদা ভাবলেন জাপানেও তাহলে আন্দোলনরত মিছিল দেখা যায় ! খুব ভদ্র দেশ তো, তাই যথাযথ ভদ্রতা বজায়

রেখে মিছিল এগিয়ে আসছিল । উপস্থিত জনসাধারণকে তারা একটা করে ব্যাগও দিচ্ছিল । কোলকাতাতেও এমন রেওয়াজ আছে । দাদা ব্যাগটা দেখার চেষ্টা করতেই বৌদি ক্ষিপ্ত হয়ে পুরো ব্যাগটাই ফেলে দিতে বললেন । আসলে মিছিলটা ছিল AIDS সর্তকীকরণ মিছিল ।

জাপানে ছুটির ঘোষিত নীতির logic ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে কিছুতেই বোঝাতে পারেন না । দাদার আক্ষেপ সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেয়ে ফেলাই একমাত্র কারণ নয় – হয়তো বৌদির হাতেখড়ির সময় ঠাকুরের ঘটে ভুলবশতঃ জলই দেওয়া হয় নি । শুকনো ঘট আর dry brain একই ব্যাপার ।

কিন্তু এই বৌদিকে নিয়েই তো দাদাকে থাকতে হবে । অতএব জাপানের ঘোষিত ছুটি নিয়ে বৌদির যতই উষ্মা থাকুক না কেন, দাদা বৌদির দাম্পত্য জীবন বিঘ্নিত না হওয়াই ভাল । বৌদিকে নিশ্চয়ই জাপানের Prime Minister করা হবে না – এটাই স্বস্তির । বৌদিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী করা হলে জাপানের scheduled national holiday-র সঙ্গে বৌদির দোল দুর্গোৎসবের ছুটি মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত । জাপানের সম্রাট হয়তো তাঁর প্রাসাদের balcony-তে বসে বা দাঁড়িয়ে গলায় spanish guiter ঝুলিয়ে, অন্যান্য মন্ত্রীদের drum, keyboard-এ বসিয়ে, অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে ও স্বরে রবীন্দ্র rock গান গাইতেন,

‘এ ছুটি তুমি থামাও বন্ধু, থামাও,
ছুটির টানেতে দেশটা ডুববে
রমলাকে তুমি থামাও,
বন্ধু, জাপানকে তুমি বাঁচাও’ । ।

অনুরণন

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

জুলাই মাসের শেষ। এরই মধ্যে রোদের তেজে বাইরের দিকে তাকানো যায় না। এ বছর গরমটা বড় অস্বাভাবিক। মনে হয় যেন সব আগল ভেঙ্গে রাজ্যের আক্রোশ নিয়ে গ্রীষ্ম তেড়েফুঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সকাল শেষ হয়ে দুপুরও অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীরটাকে কোনরকমে টেনে এনে ঘরে ঢোকে মিকা। এসিটা চালিয়ে খাটের উপর এলিয়ে পড়ে চোখ বোজে সে। প্রচুর খাটুনি গেছে আজ। অনেক দিন থেকেই অনেক কাজ করছি করবো বলে ফেলে রেখে আর করাই হয়ে ওঠেনি। অফিসের কাজ আর সংসার সামলে সেরকম ভাবে সময় পাওয়া মুস্কিল। আজ একরকম জেদ করেই সব নিয়ে বসেছিল সকাল থেকে। সব না হলেও মোটামুটি গুছিয়ে তুলতে পেরেছে। বাকীটা পরে আবার দেখা যাবে ভেবে ঘরে এসেছে। আজ থেকে তার অফিসে গরমের ছুটি শুরু। শনি রবি নিয়ে প্রায় সপ্তাহ দুই-এর মতন। ওদের অফিসটা পুরোপুরি মহিলাদের। অফিসের মালিক থেকে নীচু স্তরের কর্মীরা পর্যন্ত সব মহিলা। তাই মেয়েদের নানান সমস্যা, অসুবিধাগুলি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারে সকলে মিলে। তাছাড়া ছুটিছাটার সুবিধাও অন্যান্য অফিসগুলির থেকে বেশী। গরমের এই ছুটিটা সকলে মিলে ওকিনাওয়াতে মিকার বাপের বাড়ীতে কাটায়। ছেলে-মেয়ের গরমের ছুটি অনেক দিন আগেই শুরু হয়ে গেছে। তারা তাই আগেই চলে গেছে। মিকাও আগামী কাল রওনা হবে। শুধু তার স্বামী জয় আপাতত বিদেশে অফিসের কাজে। ফিরতে এখনও মাসখানেক দেরী। এ বছর সে সঙ্গে থাকতে পারছে না। মিকার মনটা খারাপ হয়ে যায়। শীতের ছুটিতে ওরা জয়ের বাবা-মার কাছে আমেরিকাতে যায়। নানান কথা চিন্তা করতে করতে কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছে মিকা। ঘড়ির বাজনার মিষ্টি আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে চারটে বাজে। উঠে বসেই বুঝলো ভীষণ খিদে পেয়েছে। পাবে নাই বা কেন ? সেই কোন সকালে খেয়ে কাজে লেগেছিল। তারপর ক্লান্তির চোটে দুপুরের খাওয়াটা আর হয় নি। একটু চিন্তা করে এক গ্লাশ ঠাণ্ডা কফি আর এক স্লাইস টোষ্ট নিয়ে এসে বসলো খাবার টেবিলে। খেতে খেতে টিভিটা চালিয়েই দেখলো জুনিয়র হাইস্কুলের ১৪ বছরের একটি ছেলের raggingএর জন্য আত্মহত্যার খবর যা আজ ক'দিন ধরে সমানে দেখিয়ে চলেছে। তাড়াতাড়ি টিভিটা বন্ধ করে সে। ভাল লাগে না এসব খবর। কারই বা ভাল লাগে ? কিন্তু সে নিজে একজন ভুক্তভোগী যে। তাই তার স্পর্শকাতরতা অনেক বেশী অন্যান্যদের তুলনায়। এ ধরণের খবর তার স্মৃতির বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে। হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসে মনের গভীরে অনেক কষ্টে ঢাকা দিয়ে রাখা ভুলতে চাওয়া দুঃখের দিনগুলি। পারলে রবার দিয়ে মুছে ফেলে সেই সব স্মৃতি। মনে প্রাণে সে অনুভব করে এই সব হতভাগ্যদের ব্যথা-বেদনা-অসহায়তা। এই ছেলেটির অবস্থা বড়ই করুণ। তাকে দিয়ে আত্মহত্যার রিহার্সাল করিয়েছে তার অত্যাচারীরা। শুধু তাই-ই নয়, স্মরণ সভাও করেছে তার ছবি সাজিয়ে। আর সব থেকে দুঃখের ব্যাপার সেই সভার জন্য স্কুলেরই কয়েকজন শিক্ষক বিদায়বাণী লিখে পাঠিয়েছেন। নিষ্ঠুরতার সীমাহীনতায় বার বার শিউরে ওঠে মিকা। মনে মনে ভাবে ছেলেটির কি কোনও বন্ধু ছিলনা, যে বা যারা তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারতো, একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারতো ? হয়তো ছিল, কিন্তু ভয়ে কোন রকম সাহায্য করতে পারে নি। শুনেছে অন্যান্য ক্লাশের কিছু ছাত্র ছাত্রী ragging-এর ব্যাপারটা শিক্ষকদের জানিয়েছিল, কিন্তু কেউ পাত্তা দেন নি। জেনেছে আত্মহত্যা করার আগে একটা চিঠিতে ছেলেটি তার অত্যাচারীদের নাম লিখে গেছে। সেই দলের পাণ্ডা যে ছেলেটি তার মা পিটিএ-র একজন প্রভাবশালী মহিলা। তিনি নাকি বলেছেন তার ছেলেকে মিথ্যাই দোষ দেওয়া হচ্ছে। সে আর তার কয়েকজন বন্ধু মিলে একটু দুষ্টুমি করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। এই বয়সের ছেলে তো দুষ্টুমি করেই থাকে। কে ভেবেছিল যে বোকার মতন সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করবে সে। মিকা অবাক হয়ে ভাবে এ কেমন মা ? এই কি মায়ের রূপ ? ছেলের এত বড় অন্যায়ের পরেও প্রশ্রয়, আর সব দোষ গিয়ে পড়লো নিরীহ মৃত ছেলেটার উপর ? এই সব মায়েদের জন্যেই দিন দিন ছেলে মেয়েরা এমন নিষ্ঠুর, এমন অমানুষ হয়ে উঠছে। প্রাণের গুরুত্ব সম্বন্ধে এদের কোন বোধ, কোন ধারণাই নেই। এইসব মায়েদেরও কি আছে ? ছোটবেলা থেকে বাড়ীতে, স্কুলে সব সময় সহমর্মীতা সহৃদয়তার শিক্ষাই পেয়েছে মিকারা। শুধু মানুষেরই নয়, সবরকম প্রাণীরই প্রাণের মূল্য সম্বন্ধে তাদের সব সময় সচেতন করেছেন বড়রা। এই মায়েরা তারই সমবয়সী নিশ্চয়ই। এরা কেন এমন ? কি ধরণের শিক্ষা এরা পেয়েছে ভেবে কূলকিনারা পায় না মিকা। এসব কথা চিন্তা করতে করতে মনে পড়ে যায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা। সে কিছু কম যন্ত্রণাময় ছিল না। তবে তাকে কোনরকম শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় নি। তার অনেক বন্ধু ছিল যারা সব সময় তাকে সঙ্গ দিয়েছে, আড়াল করেছে। তারা না থাকলে কে জানে তার জীবন কোন্ পথে বাঁক নিত ! সে-ও কি শেষ পর্যন্ত ঐ ছেলেটির মতন আত্মহত্যার পথ বেছে নিত ? তার বন্ধুভাগ্য বড় ভাল। তার আজকের এই সফল জীবনের পিছনে বন্ধুদের যে অবদান তা সে কোনদিন ভুলবে না। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে তাই সে তাদের নাম দিয়েছে 'ভিটামিন এফ'। মিকারা আসলে ওকিনাওয়ার। বাবার কাজের সুবাদে তোওকিয়ো আসা। বয়স তখন ছয় বছর আর ভাইয়ের দুই। ওর সব থেকে ছোট ভাইয়ের জন্ম কিছু বছর পরে। তোওকিয়োতে এসে মিকা ভর্তি হয় ওদের অঞ্চলের জন্য নির্দ্দিষ্ট সরকারী প্রাথমিক স্কুলে। স্কুলের যথেষ্ট সুনাম। মডেল স্কুল হিসাবে সারা জাপানে পরিচিত। দেশের নানা জায়গার স্কুল থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা আসেন এই স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি দেখতে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ পরিবারের কেউ না কেউ উপস্থিত থাকেন। মিকার স্কুল খুব পছন্দ হয়। এমনিতে তার স্বভাব হাসিখুশী মিশুকে। তাই বন্ধু জুটে যায় সহজেই। পছন্দের স্কুল , বন্ধু সব মিলিয়ে মিকার বেশ আনন্দেই দিন কাটে। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই তার দুর্ভাগ্যের শুরু।

প্রথম বছরের মাঝামাঝি ওদের ক্লাশের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে গেলেন। ফলে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে প্রথম বছরটা কাটিয়ে ওরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলো ততদিনে ওদের ক্লাশ অন্যান্য ক্লাশের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এই সময় যিনি ওদের ক্লাশের ভার নেন তিনি ছিলেন কড়া ধাতের মহিলা। প্রথম ঝাপ্টাটা আসে তাঁর কাছ থেকেই। পিছিয়ে পড়া ক্লাশ হাতে পেয়ে তিনি যেন প্রতিশোধ নিতে উঠেপড়ে লাগলেন। কিছুটা হয়তো ক্ষতি সামলে অন্যান্য ক্লাশের সঙ্গে সমান করার জন্য। কিন্তু তার চোট এসে পড়লো ছাত্রছাত্রীদের উপর। তারা শাস্তি পায় কি কারণে তা জানে না। জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই। নিয়ম করে মিকার বাড়ী ফিরতে দেরী। কারণ জিজ্ঞাসা

করলে সে বলতে পারে না । শুধু এইটুকু জানে যে দুপুরের খাবার সময়ের পরে তার আর আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ের পড়ার টেবিল চেয়ার ক্লাশের দরজার বাইরে রাখা থাকে । মিকার মা চিন্তিত হয়ে উঠলেন । মিকা পড়াশোনায় বেশ ভাল । অথচ দিন দিন মেয়ে বদলে যাচ্ছে । অকারণে কাঁদে । অত প্রিয় স্কুলে যেতে ভয় পায় । অন্যান্য মায়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুবিধা হোল না । সকলেই মহিলাকে ভয় পায় । এ-ও জানলেন অনেক ছেলে মেয়েই ওর জন্যে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে । অফিসের কাজে সদা ব্যস্ত বাবাকে মিকার মা সহজে সাংসারিক ব্যাপারে বিব্রত করতে চান না । কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বললেন । যদিও মিকার ব্যাপারটা একটু আধটু ওর কানে আগেই তুলেছিলেন । সব শুনে উনি ঠিক করলেন পিটিএ-র মিটিংএ যাবেন আর এই নিয়ে কথা বলবেন সেখানে । মিকার বাবা মানুষটা শান্ত, কিন্তু অন্যায় একেবারেই সহ্য করতে পারেন না । মিকার মা ভয় পেলেন মিটিংএ কি বলতে কি বলে বসবেন মানুষটা কে জানে । আসলে ভয়ের আরেকটা কারণও ছিল । ওকিনাওয়া তখন সবে আমেরিকার হাত বদল হয়ে জাপানের হাতে এসেছে । তাতে জাপানীরা খুব খুশী । তবু তখনও তারা ওকিনাওয়ার মানুষজনদের বিদেশী বলে ভাবতেই অভ্যস্ত । যাইহোক, মিকার বাবা বেশ দক্ষতার সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে এলেন । কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে । মেয়ে একেবারেই পাল্টে গেছে স্বভাবে । সেই হাসিখুশী প্রাণচঞ্চল মিকা আর নেই । তবে ওদের ভাগ্য ভাল, তৃতীয় বছরে যিনি ওদের ক্লাশের দায়িত্ব নিলেন তাঁর শিক্ষিকা হিসাবে খুব সুনাম ছিল । স্কুলের নিয়ম অনুসারে নতুন ক্লাশ শুরু হবার আগে মিকার মা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে খুবই অবাক আর খুশী । মেয়ের কথা কিছু বলার আগেই উনি যেন মনের কথা পড়ে ফেলেছেন । মাকে সব ঠিক হয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে বলেন তিনি । মায়ের চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল । সত্যি বলতে কি, মিকাকে স্বাভাবিক করে তুলেছিলেন তিনি তাঁর অসীম ধৈর্য আর মমতা দিয়ে । মিকা তাঁকে আজও ভোলে নি । সেই উমেমোতো সেনসেই-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত । প্রচুর ভালবাসা পেয়েছে তাঁর কাছে । ছোট বড় সব ব্যাপারেই ছুটে ছুটে গেছে ওর কাছে । দেখা করতে গেলে খুব খুশী হতেন । মিকা আর তার কয়েকজন বন্ধু পালা করে যেত এই বৃদ্ধা অবিবাহিতা শিক্ষিকার কাছে । ওঁর কাছে এরা সন্তানের মতনই ছিল ।

প্রাথমিক স্কুলের বাকী তিনটে বছর নির্বিঘ্নে কাটলো মিকার । কিন্তু ঝামেলার শুরু আবার জুনিয়র হাইস্কুল থেকে । ওর ক্লাশের কিছু ছেলে মেয়ে ওর পিছনে লাগতে শুরু করলো । মিকার যেটা কষ্টের কারণ ছিল তার মধ্যে বন্ধু বলে জানতো এমন কয়েকজনও ছিল । নানা ভাবে তাকে হেনস্থা করা, সব ব্যাপারে বাদ দেবার চেষ্টা, আরও কত কি । কারণ সে নাকি বিদেশী, নোংরা ইত্যাদি । সে সব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তার কিছু বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্যে । কিন্তু মিকার দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয় নি । হাইস্কুলে ঢোকার সময় প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় । সকলেই প্রায় আলাদা আলাদা স্কুলে । তবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েই গেছে । মিকা যে স্কুলে গেল সেটা একটা প্রাইভেট মেয়েদের স্কুল । নিয়ম কানুনও তাই অন্যান্য স্কুলের থেকে একটু আলাদা । প্রাথমিক স্কুলের মতন এখানেও প্রথম ঝাপ্টাটা এলো একজন শিক্ষকের কাছ থেকে । স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী চুলে রং করা, কার্ল বা পাম করা কিছুই চলবে না । অর্থাৎ চুল স্বাভাবিক থাকবে । মিকার চুল সামান্য কোঁকড়ানো । সেটা যে স্বাভাবিক সে সম্বন্ধে স্কুলের নির্দেশ অনুসারে বাড়ী থেকে আগেই স্কুলে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল । কিন্তু যে কারণেই হোক সেটা ঐ শিক্ষকের পছন্দ হচ্ছিল না । নানাভাবে ওকে জ্বালাতন করতে শুরু করেন তিনি । একদিন স্কুল থেকে ফিরে কেঁদেকেটে মিকা জানালো যে দ্বিতীয়বার আর ঐ স্কুলে যাবে না । কারণটা বাবা মা মোটামুটি বুঝলেন, কিন্তু আসলে কি হয়েছিল, ঐ শিক্ষক কি বলেছেন তা কিছুতেই মেয়ের মুখ থেকে বার করতে পারেন নি তাঁরা । মেয়ের শেষ কথা তাকে জোর করে স্কুলে পাঠালে সে সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, তবু স্কুলে যাবে না । মেয়েকে তাঁরা চিনতেন । কোন রকম অন্যায় জেদ সে করে না, তা-ও জানতেন । বাধ্য হয়ে তাকে স্কুল ছাড়ালেন । এবার সমস্যা তাকে নিয়ে কি করা যায় ? অন্য স্কুলে যেতে হলে একটা বছর নষ্ট করতে হবে । শেষ পর্যন্ত বাবার এক বন্ধু আমেরিকাতে একটি পরিচিত পরিবারে থেকে সেখানেই পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন । তার পর মিকাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি । পড়াশোনায় সে চিরকালই ভাল । ভাল পরিবেশে এসে আরওই সফল সে । যে পরিবারে সে থাকতে এসেছিল, সেই ওয়েন পরিবারে দুই ছেলে মেয়ে – জয় আর এমিলি । এমিলি মিকার সমবয়সী । জয় ওদের থেকে একটু বড় । প্রথম দিকে দ্বিধার ভাব কিছুটা মিকার থাকলেও, সকলের আপন করা ব্যবহারে তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে নি । এমিলি আর মিকা হয়ে ওঠে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু । জয়ের সঙ্গে হৃদ্যতা শেষে বিয়েতে এসে ঠেকে । দুই পরিবারই খুব খুশী তাতে । মিকার দুটি ছেলে মেয়ে – ১৪ বছরের কেন্ আর ১০ বছরের এমি । নিজের স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে প্রথম থেকেই তাদের ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করেছে । আর তার এই সিদ্ধান্তের জন্য সে খুশী ।

আনমনে নানা কথা চিন্তা করতে করতে তার নিজের ভুলতে চাওয়া অতীতটাও ঘুরে এলো । মিকার মনটা বড় বেশী ভার হয়ে উঠেছে । হুঁশ ফিরে আসতেই আবার ঐ ছেলেটির কথা মন জুড়ে বসে তাকে অস্থির করে তুললো । কিছুই বদলায় নি গত তিরিশ চল্লিশ বছরেও । স্কুলগুলিই বা কেমন ! তাদের কি কোনই দায়িত্ব নেই ? কিছুই করার নেই নিজেদের নাম বাঁচানো ছাড়া ? কেন এমন হয় ? কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে । প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিজেকেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলে ।

I shall tell you a great secret, my friend. Do not wait for the last judgment, it takes place every day.

- Albert Camus

জর্জ গায়েন

- শংকর বসু

সময় তখন সাদায়-কালোয় লুকোচুরি
চেতনার ভোর কুসুম রঙে ছোঁয়া
রাজারও নেই রাজপাট,
তবু ছুঁড়ে ফেলা হল খাতাখানা নর্দমার ঘোলা কাদায় পাঁকে
সপ্তসুরের কান্না ঢাকা হল বৈয়াকরণের কাঁচির ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে
নিঃসঙ্গ গায়কের সামনে তোলা হল পাকা দেয়াল
যাতে ভূতের রাজারও মেলে না সঙ্গত ।
লোকচক্ষুর আড়ালে তখন একাকী গায়েন
আলোর বিন্দুর মত মৃদু
তার অনন্ত নিভৃতের গান মাটির গভীর থেকে গুমগুমিয়ে
ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে গেল বেবাক বোবার দেশে
মন্ত্রীমশাইদের মুখ ঢাকা পড়ল কালো কাপড়ের অন্ধকারে
না বুঝে কারে তুমি .... ।

হাল্লা রাজার দল এখন খোলা হাওয়ায় খুশ
সময় ভুলে গেছে সেসব দিন, একাত্তর, আটাত্তর, লোডশেডিং
বদল-হাওয়া কালচারালি শক্ত সমাজ
খেলার মাঠে মেলার মাঠে রাইটারস্ বিল্ডিং-এ
ঘুর পাকানো গলি হয়ে জেব্রা ক্রসিং
জর্জ গায়েনের গানে কাটে সারাটা দিন
শত বছরের পথ পেরিয়ে আরও কত
দৈনিক যুদ্ধ থামিয়ে দেবে –
পৃথিবীর মেঘস্নান সারা হলে
গুনগুন ঘুমগান
তোমারে সেলাম । ।

(রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বনামধন্য শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

It is thought which is the propelling force in us. Fill the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month and after month.

- Swami Vivekananda

সূর্যস্নান

- জ্যোতির্ময় রায়

এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই দ্রুতগামিনী হয়েছো,
আমি শুধু স্থির এই খাটের ওপর
অস্থির মন নিয়ে স্থবির রয়েছি ।
কেমন আলোর আঁচল দুলবে কাল ভোরে,
শিউলি আর শিশিরকে জানিয়ে,
কত টিয়ে উড়ে যাবে উত্তর আকাশে ।
ঘাস আর কুয়াশা জড়িয়ে
মনে হবে ধুমায়িত চায়ের পেয়ালা ।
তোমার চিবুক বুক মনে পড়ে
ঘন চুল, কালো চোখ, জানালার অন্ধকার ঘরে
কখন যে নেবে আসে ।
কাল ভোরে আবার তোমাকে পাব ।
তুমিও কি তাই ভাব
একটু ওপাশ ফিরে, কাত্ হয়ে দেখে নিয়ে ?
তবে শুধুই কি সবুজ টিয়ে উড়ে গেল ডানা ঝাপটিয়ে
মেঘের পাহাড়ের পানে
সূর্য স্নানে । ।

মিত্তির বাবুর বাজার করা

- নমিতা চন্দ

সাত সকালে মিত্তির বাবু
ব্যাগটি নিয়ে হাতে,
বাজার করতে নাড়ু গোপালকে
নিয়ে গেলেন সাথে ।

বাজার সেথা নয়তো কাছে
মাইল চারেক দূর,
চলতে চলতে গান গেয়ে গেয়ে
মিলাতে লাগলেন সুর ।

হরেক রকম শাক সব্জি
বাজারেতে দেখে
কোন্ জিনিষটা কিনবেন তিনি
সারা হলেন ভেবে ।

নাড়ু বলে, 'এবার চলো, অনেক হোল বেলা
বাড়ি গেলে মা যে ভীষণ রেগে হবেন সারা' ।

মিত্তির বাবু বলেন তখন, 'ঠিক বলেছিস নাড়ু
দেরি করে ফিরলে ঘরে হবে ভীষণ জ্বালা'।
কিনলেন শেষে মিত্তির বাবু
এক ছড়া কাঁচা কলা ।।

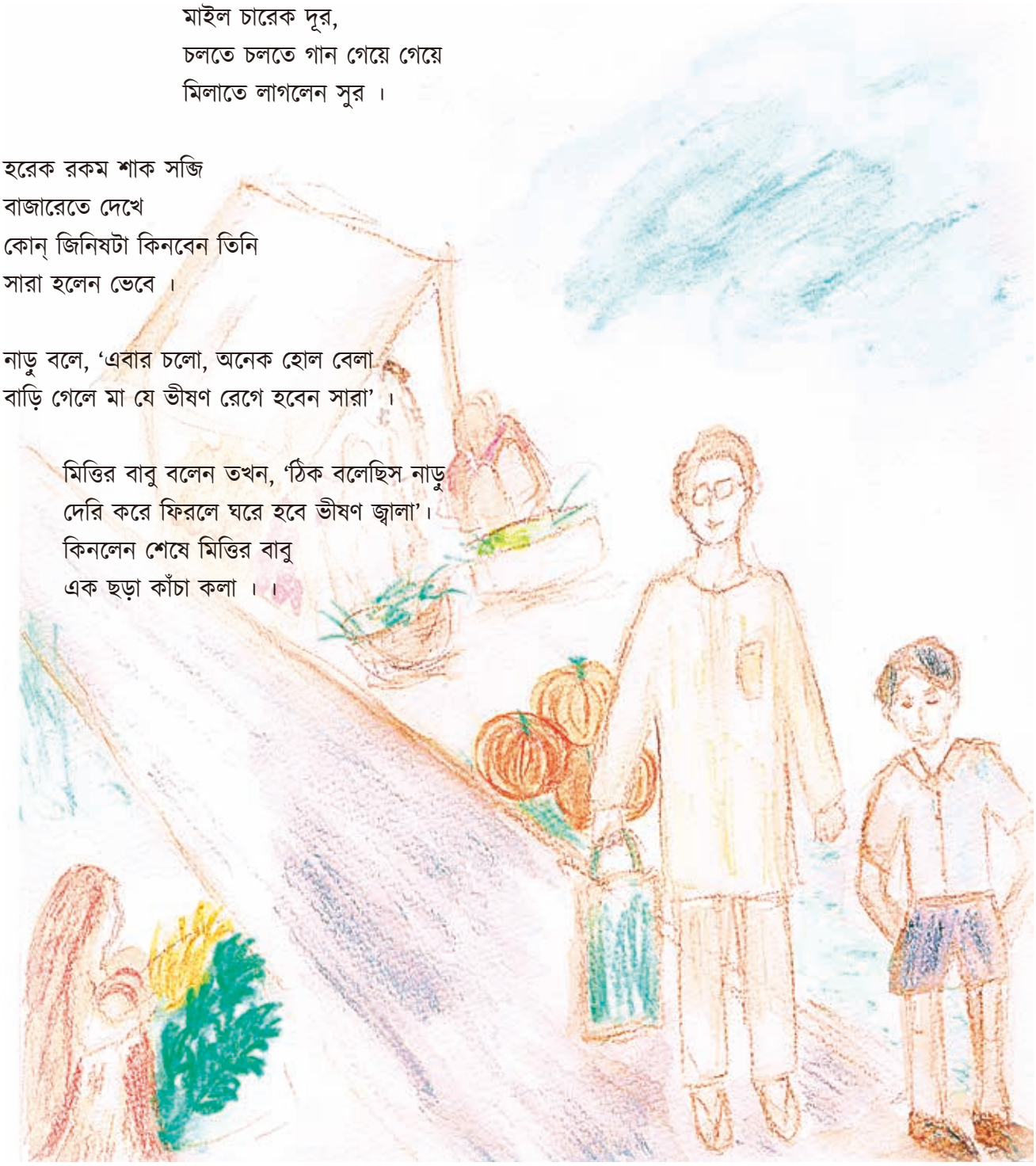

সুন্দরের জন্য

- ইমরোজ নাওয়াজ রেজা

কথা খুঁজে শব্দ গুঁজে
রাতপাখি সময় যাপন
ঘুমোবার সময় তো নেই
আঁধারে চাঁদের আলো
চাঁদের ও আধেক ঢাকা
ঢেকে রাখা অন্ধ গলি
অন্ধের মতোই বাঁচা
শরীরে পোড়ার দাগ ।

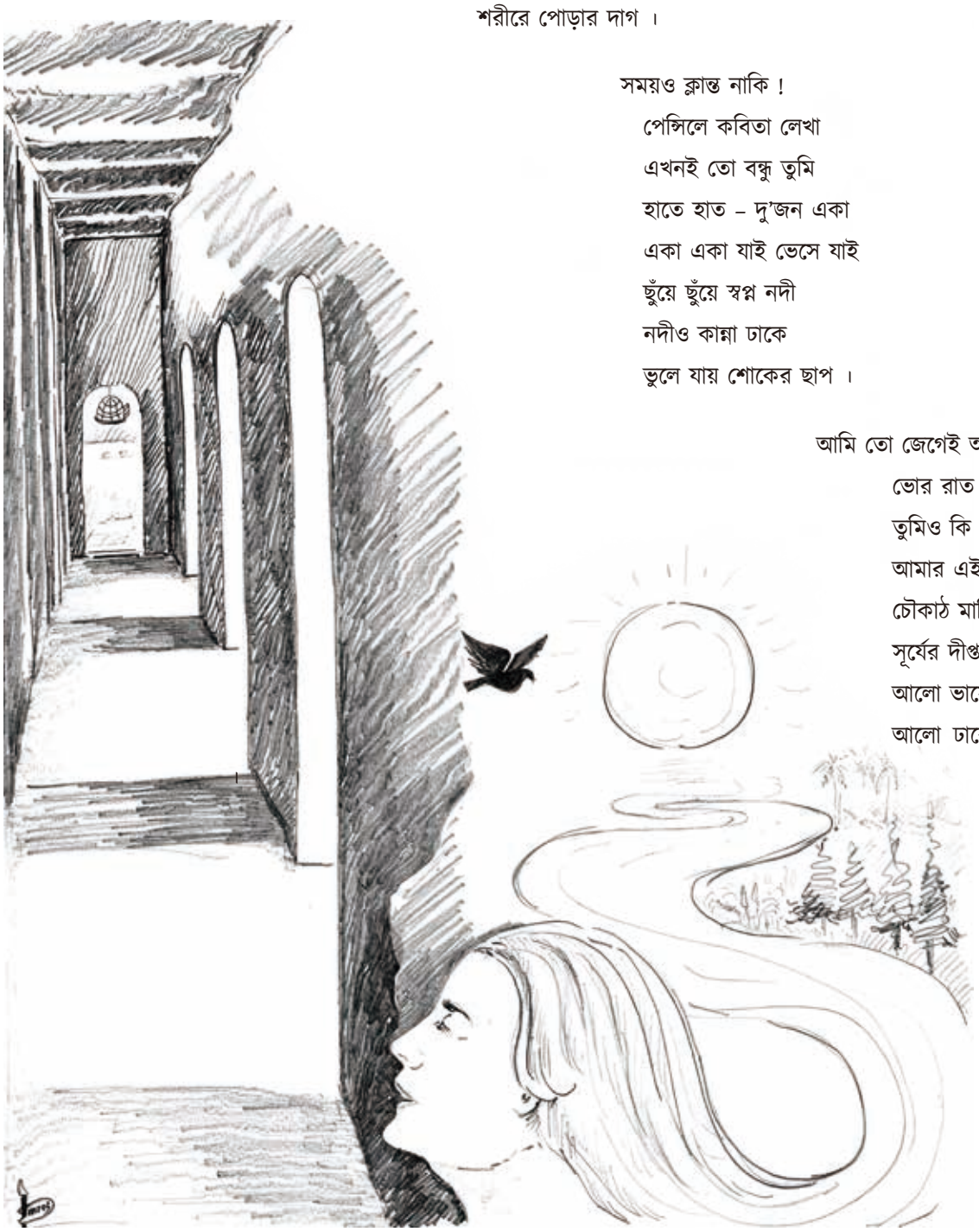

সময়ও ক্লান্ত নাকি !
পেন্সিলে কবিতা লেখা
এখনই তো বন্ধু তুমি
হাতে হাত – দু'জন একা
একা একা যাই ভেসে যাই
ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্বপ্ন নদী
নদীও কান্না ঢাকে
ভুলে যায় শোকের ছাপ ।

আমি তো জেগেই আছি
ভোর রাত দেখবো বলে
তুমিও কি দেখবে সাথে
আমার এই ঘর-দুয়োরে
চৌকাঠ মাড়িয়ে হাসে
সূর্যের দীপ্ত বসন ?
আলো ভাসে শরীর মনে –
আলো ঢাকে পোড়ার দাগ ।

রবিপুজো
(রবীন্দ্রজয়ন্তীর জোড়াসাঁকো)

- দুহিতা সেনগুপ্ত

ও বাবা ও বাবা রবিঠাকুর কি
দুর্গারই এক ভাই ?
চুপ কর্, তোর এটুকু বোঝার
Common sense-ও নাই ?
Common sense লাগিয়েই তো
বললাম বেশ ভেবে,
দুজনেরই তো surname same
মিলছে তো হিসেবে ...
তাছাড়া, দেখো অকালে কেমন
দুর্গাপূজার সাজ,
Weekdayতেও মানুষের ভিড়
ফেলে দিয়ে সব কাজ ।
হায় রে, আমার পোড়া কপাল !
Class VII –এ পড়িস
এখনও ওনাকে ঠাকুর ভেবে
নমো নমো করিস ?

সবাই করে, আমিও করি, তবে
বলো, কি চাওয়ার আছে ?
কবিতা, গান, নাটকের আজ
কোনও career আছে ?

এই তো একটা জায়গা পেয়েছি
বাবা ফেলে নিঃশ্বাস ...
ছেলের ভুরু কুঁচকে ওঠে
চোখে আষাঢ় মাস
এইখানে শুধু গান শুনবো ?
কল্পনা বানচাল
শরীর নড়েনা, মাথা নড়েনা
শুধু ডানহাত দেয় তাল ...
চিন্তা কিসের ? এনেছি তো সেই
মুস্কিল আসান সাথে
পকেট থেকে ছোট পৃথিবী
নিমেষেই আসে হাতে ...
Unlock-menu-games-race
পটাপট যায় খুলে
কোথায় রবি, কোথায় গান
সবকিছু যায় ভুলে
হঠাৎ সামনে চোখে পড়ে এক
বিশাল মূর্তি কালো
মোমবাতি আর মালার ভারে
চারিদিক করে আলো
সবাই যাচ্ছে মালা হাতে, তবে
মালাটা প্রধান নয়
কালো শরীরকে জড়িয়ে ধরে
ছবি না তুললে হয়
বেশ সুন্দর এক pose-এর সাথে
Cameraman-এর ক্লিক
পরের দিনই facebook-এ সেটা
হবে profile pic
Wall-এ wall-এ status দেখবে
"VISITED JORASANKO"
Like, unlike, comment সাগরে
রবিকে কি কেউ ডাক ?
যাইহোক, তবে ছেলেটি বা কেন
ছবি তোলা থেকে বাদ
বাবাকে বলে তার যে বড়
মালা পরানোর সাধ
মালা পরানো হয়ে গেলে পরে
এবার প্রণাম তবে
ছেলে করছে রবিপ্রণাম
ছবি না তুললে হবে ?
মাথা ঠুকে ঠুকে মূর্তির পায়ে
Pose দেয় ছেলে নানা
দোষ আসলে মূর্তিটারই
দাড়িটা বড্ড টানা
দুটো গান শুনে ছেলেটার কান
হয়ে গেছে নাকি ভারী
এবার তার ইচ্ছা তবে
ঘুরবে ঠাকুরবাড়ী
সব দেখা সব বোঝার শেষে
মত দিয়ে ফেলে ছেলে
এ তো প্রায় সব আমাদেরই মতো
Difference কিছু পেলে ?
রান্নাঘরে রান্না হোত,
বসার ঘরে chair
এর জন্য এতো মানুষ
কেন করে care ?
বাবা বলে বাঙালীর ছেলে
ওসব বলতে আছে ?
এখানে সবাই রবি অনুরাগী
কেউ যদি শোনে পাছে
বরং তাঁকে বার বার
ধন্যবাদ জানা
নতুন এক পৃথিবীর তিনি
দিয়েছেন ঠিকানা
শুধু কি তাই, ছেলে বলে
আছে মোদেরও উপহার
আনকোরা দু দিন ছুটির আমেজ
এমনিতে মেলা ভার ...।।

আধুনিক কবি

- বিশ্বনাথ পাল

ও পাড়ার শ্যাম নাকি আধুনিক কবি,
আধুনিক ছড়া লেখা শুনি তার Hobby ।
যে ছড়ায় মিল নেই, নেই কোনো ছন্দ,
তাতে নাকি ভরা থাকে আধুনিক গন্ধ ।।

আধুনিক ছড়া লেখা নয় মোটে সোজা,
তার চেয়ে শক্ত মানে তার বোঝা ।
তাতে ভরা থাকা চাই ভারী ভারী শব্দ।
যার মানে উদ্ধারে অভিধানও জব্দ ।।

যত বেশী হবে সেটা পাঠকের অবোধ্য,
তত নাকি উন্নত মানের সে পদ্য ।।

এমনই কঠিন ছড়া লিখলেই তবে,
আধুনিক কবি বলে সুখ্যাতি হবে ।।

আধুনিক ছড়া লেখা নয় মোর কর্ম,
সে কথাটা বোঝানোই কবিতার মর্ম ।।

One needs a power of vision and sympathy in order to discover the truth which is the innermost creative force of a people

- Rabindranath Tagore